সেকাল ও একাল

'তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ', 'হিমালয়পারে কৈলাস ও মানস-সরোবর',
'হরি যাকে রাখেন', 'হিমালয়ের মহাতীর্থে', 'গঙ্গোত্তরী ও
যমুনোত্তরী', 'অবধূত ও যোগিসঙ্গ' প্রভৃতি
গ্রন্থ-প্রণেতা

শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ও চিত্রিত

এ. মুখার্জী এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড

প্রকাশক : অমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ১২

প্রথম সংস্করণ—আষাঢ়, ১৩৫৮

মূল্য দুই টাকা আট আনা মাত্র

মুদ্রাকর : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস
৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা

উৎসর্গ

জীবনের বিচিত্র পথে চলতে চলতে আজ এই পঁয়ষট্টি বৎসরের শেষাশেষি এসে চারিদিকে দুর্যোগের ঘনঘটা দেখে অবসন্ন হয়ে খানিক দাঁড়িয়েচি ;—চেয়ে দেখি, আমার চারিদিকে ঘিরে বেশ একদল ছোট বড় নাতি নাত্‌নী আমারই দিকে চেয়ে চেয়ে হাসচে ;—তাদের দৃষ্টিতে নবীন প্রাণের আশার আলো, মনে অফুরন্ত উদ্যম, সর্বাঙ্গে আনন্দের শিহরণ।

দেখতে দেখতে তাদের সেই পুলকের ছোঁয়াচ লেগে গেল আমার মনে, আর সঙ্গে সঙ্গে ভুলিয়ে দিলে বর্তমানের আমার এই দুর্দিনের অবসাদ। এইখানেই আমার একালের সঙ্গে তাদেরও একালের যোগাযোগ ঘটে গেল,—তাইতো আমার এই 'সেকাল ও একাল' তাদেরই উৎসর্গ ক'রে ধন্য হ'লাম।

কলিকাতা,
২০শে আষাঢ়, ১৩৫৮।

একটু পরিচয়

এই বইখানিতে 'সেকাল'-এর যে কথাগুলি রয়েচে তা' পরম ভাগবত স্বর্গত রাধাবিনোদ গোস্বামী মহাশয়ের কাছেই পাওয়া। তিনি ভাগবত পাঠ এবং ব্যাখ্যার মাঝে মাঝে এই রকম অনেক গল্পই করতেন। তখনকার দিনে স্বর্গীয় নীলকণ্ঠ গোস্বামী মহাশয়ের পর ভাগবত-ব্যাখ্যার এবং ভগবদ্দর্শনের ক্ষেত্রে তাঁর অনন্যসাধারণ শক্তি এত শীঘ্র এ-দেশে কারও ভুলে যাবার কথা নয়।

'সেকাল'-এর ঐ গল্পগুলি ছোটদের বার্ষিকী, উত্তরা, ঝলমল প্রভৃতি কয়টি পত্রিকার পূজা-সংখ্যায় বেরিয়েছিল,—আর 'একাল'-এর কথা যা' কিছু তা' 'কৈশোরক', 'মৌচাক' প্রভৃতি ছোটদের মাসিকের মধ্যে সময় সময় বেরিয়েছিল;—এখন, সবগুলি সংগ্রহ ক'রে একত্র 'সেকাল ও একাল' নামে প্রকাশিত হ'ল।

এর জন্য ঐ সকল পত্রিকার অধিকারী থেকে এই গ্রন্থের প্রকাশক পর্যন্ত প্রত্যেক মহাশয়ের কাছে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করচি।

২০শে আষাঢ়, ১৩৫৮ সাল
৭৭, রসা রোড সাউথ
টালিগঞ্জ, কলিকাতা ৩৩।

প্রমোদকুমার

সূচীপত্র

সেকালের কথা
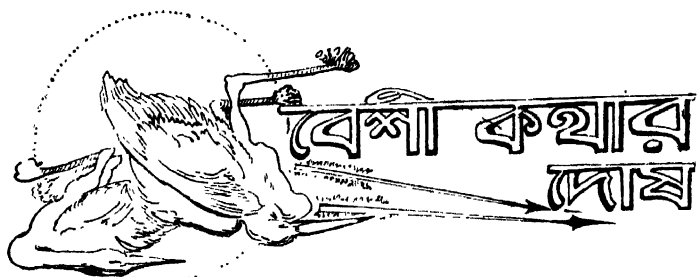
—এক—

এখনকার দিনে এটা আমরা স্পষ্টই দেখতে পাই যে, আগেকার দিনের লোকেদের তুলনায় আমাদের শক্তির পুঁজি খুবই কম। তার ওপর ক্ষয়তো লেগেই আছে। যত রকমে আমাদের শক্তি সঞ্চয় হচ্ছে, ক্ষয়ও হচ্ছে সেই অনুপাতে। নানাভাবেই ঘটছে এই ক্ষয়, তবে বাজে কথাতেই সবচেয়ে বেশী। এই কথাটা যদি আমরা সব সময় মনে রাখি তবে আমাদের উপকার হ'তে পারে অনেক। সেই সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে বাক্-সংযমই হচ্ছে যথার্থ শক্তিমান্ হবার উপায়। কিন্তু এই সংযম রক্ষা করা কি সকলের পক্ষে সম্ভব, না সকলের ভাগ্যে ঘটে! সবাই কি আর এই সংযমের মহিমা বুঝতে পারে? তা না পারুক,—এক রাজপুত্রের কিন্তু অল্প বয়সেই বাক্-সংযমের মহাভাগ্য হয়েছিল। তাঁর কথাই আজ তোমাদের বলছি।

রাজকুমারের বয়স যখন আঠার, উনিশ, কি কুড়ি বছর তখনই তিনি নানাশাস্ত্রে বেশ পণ্ডিত হয়ে উঠেছিলেন। তা'ছাড়া ঘোড়ায় চড়া আর অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহারেও তিনি খুব দক্ষ হয়ে ওঠেন। তীর-

ধনুতে তাঁর সন্ধান ছিল অর্জ্জুনের মতই অব্যর্থ। এক কথায়, তখনকার দিনে যে যে গুণ থাকলে রাজার ছেলে লোকসমাজের প্রিয় হ'তেন, বরণীয় হ'তেন, রাজ্যের গৌরব ব'লে সাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র হ'তেন, সে সমস্ত গুণই তাঁর ছিল। রূপে গুণে তাঁর তুলনা ছিল না বললেই হয়।

জানি না, এই অল্প বয়সেই কুমার কোন্ সুকৃতির ফলে নিশ্চিত বুঝেছিলেন যে, বাক্ বা কথার শক্তি বড় ভয়ঙ্কর। একটি মাত্র কথায় একজনের সঙ্গে আর একজনের ভীষণ ঝগড়া বেধে যায়, এমন কি রক্তারক্তি খুনোখুনি পর্যন্ত ঘটে থাকে। মানুষে মানুষে এই যে ঝগড়া-বিবাদ, রাগ-দ্বেষ, শত্রুতা প্রভৃতি অশান্তির ব্যাপার প্রতিনিয়তই দেখতে পাওয়া যায়, এর মূলে যে বাক্-সংযমেরই অভাব কুমার তা বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, বেশী কথা বলাই এ সংসারে সব চেয়ে বিপজ্জনক। মুখের একটা কথা কত অনর্থেরই না সৃষ্টি করতে পারে! তাই, কথা না বলাই ভাল। এখন, কি ক'রে তিনি এই কথাটা বুঝতে পেরেছিলেন, এবার তাই বলছি।

একবার কুমার অনেক লোকজন সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে মৃগয়ায় গেলেন—বেশ আনন্দিত মনেই গিয়েছিলেন। জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে শিকার করা হ'ল—পশু, পাখী আরও কত কি। শিকারের পর বনভোজনও হ'ল। তারপর, আনন্দে সবাই যখন মত্ত হয়ে রয়েছে, তখন বয়স্যদের এড়িয়ে রাজকুমার স'রে এলেন তফাতে; তাঁর ইচ্ছে হ'ল, একলা বনের মধ্যে নিঃসঙ্গ হয়ে খানিক ঘুরে আসবেন। কারো সঙ্গই তাঁর আর ভাল লাগছিল না। একলা খানিকটা এসে তিনি ঘন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলেন। অপূর্ব আনন্দ এল

দেখলেন—কাঠুরে কাঠ কাটছে গাছে চ'ড়ে আর নীচে দড়ি ধ'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার ছেলে।

(—পৃঃ ৪)

তাঁর প্রাণে,—তিনি চলতে লাগলেন। একলা বেড়িয়ে এমন আনন্দ এর আগে আর কখনও তিনি উপভোগ করেন নি ব'লেই তাঁর মনে হ'ল।

আরও খানিকটা ভেতরে ঢুকে তিনি দেখলেন,—একটা গাছের ওপর একজন কাঠুরে কাঠ কাটছে, আর তার ছেলে, বারো-তেরো বছর তার বয়স, হাতে দড়ি ধ'রে গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছে। একটা মোটা ডাল কাটছিল তার বাপ, ছেলেটি নীচে দাঁড়িয়ে নানান্ কথা বলছিল তার বাবাকে উদ্দেশ করে। ছেলে অবিরাম ব'কে চলেছে, বাপ কিন্তু একটিও কথা না ব'লে একমনে কোপ লাগাচ্ছে গাছের ডালে। রাজকুমার তাদের থেকে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে গেলেন; শুনলেন, বাপ চেঁচিয়ে ব'লে উঠল, "তুই থাম্‌বি?" ছেলে কিন্তু সে কথায় কান না দিয়ে ব'কেই চলল। এবার রাজকুমার দেখলেন, কাঠুরে ওপর থেকে কুড়ুলখানা নীচে ফেলে দিলে, তারপর তর্ তর্ ক'রে নেমে এল গাছ থেকে। ছেলেটার হ'ল ভয়, দড়ি ফেলে সে পালাবার চেষ্টা করলে। কিন্তু তার আগেই বাপ এসে তার কানটা ধ'রে ফেললে। তাকে না মেরে, কেবল একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, "তোকে কতবার বলেছি মুখ সাম্‌লে কথা বল্‌বি;—তা না, যা মুখে আসবে তাই বলবি তুই?—কাল তোর মাকে কাঁদিয়েছিস—বেচারী সারারাত কেঁদে কাটিয়েছে! সেদিন ঠাকুর মশাইকে যা-নয়-তাই ব'লে দিলি! আমরা কোথায় তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় রাখি, আর তুই কিনা তাঁকে বল্‌লি—বিট্‌লে বামুন! আচ্ছা, তুই কেন এমন হয়েছিস, বল্‌তো?—যার সঙ্গে কথা কইবি তারই সঙ্গে ঝগড়া বাধাবি! কত পাতক যে তোর ঐ কথার দোষে তুই সঞ্চয়

করছিস এই বয়স থেকে, তা বুঝিস তুই !” মুখ লাল হয়ে উঠল ছেলেটার, ঘাড় হেঁট ক'রে সে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

একটা কথাও বলছে না দেখে বাপ আবার একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে,—“ঐ মোটা ডালটা কাটতে আমার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে, আর তোর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই ; আমার জন্যে একটুও দরদ নেই তোর, শুধু বকর বকর ক'রে রাজ্যের যত বাজে কথা ব'কে চলেছিস। যত বলছি,—থাম্ থাম্,—তোর গ্রাহ্যই নেই। আমায় কি তুই কাজ করতে দিবিনি, পাজি বদমায়েস কোথাকার! আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন !”—এই না ব'লে, বাপ তার কান ছেড়ে দিয়ে হাত ধরলে, তারপর বললে, “হয় তুই কথা বন্ধ কর্, না হ'লে তোকে আমি হাত-পা-মুখ বেঁধে ফেলে রাখব, না খেতে দিয়ে মারব। দেখি তাতেও তোর রোগ সারাতে পারি কি না! ভগবান তোকে বোবা করেনারে!” ব'লে তাকে হাত ধ'রে হিড়্ হিড়্ করে টেনে নিয়ে চলল।

ছেলেটা এবার মাথা নীচু ক'রে বাপের পায়ে হাত দিয়ে বললে, “না বাবা, আর আমায় কিছু বলতে হবে না। শুধু এবারটা তুমি আমায় মাফ কর ; দেখবে এর পর থেকে আমি কারো সঙ্গেই কথা বলব না, একেবারে বোবা হয়েই থাকব। ঠিক বলছি বাবা, তুমি দেখে নিও।”

এবার বাপ তাকে ছেড়ে দিলে ; করুণ চোখে তার দিকে তাকিয়ে সস্নেহে বললে, “সেদিন ঠাকুর মশাই তোকে একটা কতো দামী, কতো ভাল কথা বললেন, বল্ ত'—যদি বারোটা বছর, মিছে কথা না ব'লে, বাজে কথা না ব'লে থাকতে পারিস, তাহলে বাক্‌সিদ্ধ হয়ে যাবি। মুখ থেকে আর মিথ্যে কথাই বেরোবে না, যা বল্‌বি

তাই সত্যি হয়ে যাবে। কতো ভাল হবে, বল্ ত'; শুধু তোর একার নয়, সকলের—দেশের, দশের, সমাজের। দেখ্‌বি, তখন সবাই তোকে কত ভক্তি করবে, দেব্‌তার মত পূজো করবে! তোর সে ইচ্ছে যায়নারে ?"

রাজকুমার এই নাটকটি আগাগোড়া দেখলেন আড়াল থেকে। প্রাণের মধ্যে তাঁর বিদ্যুৎ খেলে গেল; মাত্র বারোটা বছর, সত্য ছাড়া মিথ্যা না বলা, বাক্-সংযম,—এ আমি পারব, নিশ্চয়ই পারব, বাক্‌সিদ্ধ আমি হবই। মনে মনে তিনি এই প্রতিজ্ঞা করলেন। ভীষ্মদেবের মতই এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে তিনি ফিরে এলেন বন্ধুদের কাছে। তারপর রাজ্যে ফিরে আসবার পথেই তাঁর কথা বন্ধ হ'ল। তিনি আর কথা কইলেন না কারো সঙ্গে।

মৃগয়া থেকে ফিরে আসবার পর থেকে কেন যে তিনি কথা বলছেন না, তার কারণ কিন্তু কেউ জানতে পারলে না। রাজা ত' খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। প্রধান মন্ত্রী, মন্ত্রিমণ্ডল, পাত্র-মিত্র-অমাত্য সকলেই মহা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কি হ'ল যুবরাজের! কুমারের কথাবার্তা ছিল অতি মধুর, স্বভাব অত্যন্ত ভদ্র, শান্তশিষ্ট এবং বিনীত। কিন্তু তা' হ'লেও কুমার ত' এতদিন খুব স্ফূর্ত্তিবাজ, হাসিখুসী, আমুদে মানুষ ছিলেন। হঠাৎ এমন কি হ'ল রাজকুমারের, যে তিনি একেবারে নির্বাক্ হয়ে গেলেন! অথচ তাঁর মুখে ত' কোনো রকম দুঃখের মালিন্য নেই, কোনো গভীর চিন্তা বা ভাবনার ছায়াও ত' সেখানে দেখা যায় না! সুকুমার মুখে হাসি-হাসি ভাবটি ত' লেগেই রয়েছে সকল সময়ে,—নেই কেবল কথা।

কথা না ব'লে মানুষ কতক্ষণ থাকতে পারে,—কিছুক্ষণ কথা না

বলতে পেলেই ত' লোকে হাঁপিয়ে ওঠে! কিন্তু আজ ক'দিন হ'ল রাজকুমার মুখ থেকে কোনো রকম শব্দই বের করেন নি! একেবারে নির্বাক্, নিঃশব্দ! দেখে শুনে মহারাজের রাজকার্যে সুখ নেই একেবারে। গুণবান্ একমাত্র পুত্র, তার ওপর একটু বেশী বয়সের ছেলে, বংশের দুলাল, নয়নের মণি, রাজ্যের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা - তার এমন ধারা হঠাৎ বাক্-রোধের ব্যাপারে মহারাজ মহা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে মহারাজ বড় স্নেহে কুমারকে কাছে ডেকে, কত ভাবে, কত প্রকার কৌশলে, কত কথাই জিজ্ঞেস করেন— এমন কি ঘটেছে যার জন্যে তাঁকে কথা বন্ধ করতে

হয়েছে? যদি কথা না বলাই তাঁর অভিপ্রায় হয়, তা'হলে তিনি ত' লিখেও দিতে পারেন? আকারে ইঙ্গিতেও ত' জানাতে পারা যায়? জানালেই অবিলম্বে মহারাজ তার প্রতিকার করবেন, তাতে তিলমাত্র বিলম্ব হবে না।—নাঃ, মহারাজের এতটা ব্যাকুলতা দেখেও কুমারের মৌনভাব গেল না, কোন শব্দই বেরুল না

কুমারের মুখ থেকে। কোন কথা না ব'লে তিনি কেবল ঘাড়টি হেঁট ক'রেই থাকেন, আর মৃদু মৃদু হাসেন।

—দুই—

এই ভাবে মাসকয়েক কেটে গেল, কিন্তু কোন ফলই হ'ল না। মহারাজ এবার খুব বেশী রকম পুরস্কার ঘোষণা করলেন—যে কেউ রাজকুমারের মুখে কথা ফোটাতে পারবে, তাকেই দেওয়া হবে ঐ পুরস্কার। কিন্তু সবই বৃথা হ'ল। তখন মন্ত্রী বললেন, "মহারাজ, ওসব কিছু নয়। কুমার মৃগয়ায় গিয়েছিলেন। সেইখানে কিছু দেখে বা শুনে সাময়িক একটা বৈরাগ্যের কারণ হয়ত ঘটে থাক্‌বে। কিছুদিনের মধ্যেই ওসব ঠিক হয়ে যাবে, চিন্তার বিশেষ কোন কারণ নেই। আমি সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি। কুমারকে আমি কথা কইয়ে দেব নিশ্চয়ই। কিন্তু তার আগে আর একবার মৃগয়ায় যাবার যোগাড় করতে হবে।"

মন্ত্রীর কথায় মহারাজ কিছু আশ্বস্ত হলেন। তাঁর পরামর্শমত আবার মৃগয়ায় যাবার যোগাড় করতে হুকুম দিলেন। সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ হল; সুসজ্জিত রথ, হাতী, ঘোড়া, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি মৃগয়ার জন্য যা কিছু দরকার সবই গোছ-গাছ ক'রে কুমারকে জানান হ'ল। কুমার ভাবলেন, যদি এই সূত্রে কাঠুরে আর তার সেই ছেলেটিকে দেখা যায় তাহলে মন্দ হবে না। সেই জঙ্গল আর সেদিনকার ব্যাপার তাঁর মনে দাগ কেটেছিল খুব গভীরভাবেই; তাই এই মৃগয়ায় যাবার কথায় কুমার কোনরকম প্রতিবাদ করলেন না। যাত্রার সময় স্বচ্ছন্দে হাসিমুখে এসে রথে উঠে বসলেন—একেবারে মন্ত্রী মশায়ের পাশেই।

পথে যেতে যেতে মন্ত্রী কুমারের সমস্ত ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করতে লাগলেন। মাঝে মাঝে নানা সৎ উপদেশও দিতে লাগলেন। কত রকমে কত কথাই বোঝালেন—কুমার যেন এরকম ছেলেমানুষী না করেন—কথা কইবার শক্তি ভগবান যখন দিয়েছেন, তখন ভগবানের এই অমূল্য দানকে উপেক্ষা করা হবে নির্বোধের কাজ—এতে ভগবান রাগ করবেন—এম্‌নি নানান্ কথা। কিন্তু কুমারের কোন ভাবান্তর দেখা গেলনা। তিনি যেমন ছিলেন ঠিক তেমনি রইলেন—একেবারে নির্বাক্, নিঃশব্দ। মন্ত্রীর কথা অবশ্য তিনি সবই শুনতে পেয়েছিলেন কিন্তু তাঁর মুখের কথা কেউ শুন্‌তে পেল না। এমনি ভাবে একটা গোটা দিন-রাত্তির কাটিয়ে পরের দিন তাঁরা এসে পৌঁছুলেন সেই জঙ্গলের ধারে।

কিন্তু মৃগয়ার ইচ্ছে বা কোনও লক্ষণ মন্ত্রী বা যুবরাজ কারো মধ্যেই দেখা গেল না। যুদ্ধবিদ্যায় সুনিপুণ, নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রে পারদর্শী রাজপুত্র স্থির, ধীর, গম্ভীর ;—শরপূর্ণ তূণে তিনি হাতও দিলেন না। কেবল রথ থেকে নেমে খানিক সেই জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে বেড়ালেন। সেই প্রকাণ্ড গাছটার কাছে গিয়ে দেখলেন,—গাছটা সম্পূর্ণ ই কাটা হয়ে গেছে, কেবল তার গুঁড়ির ওপর হাত খানেক বাদ দেওয়া হয়েছে।

মন্ত্রী তাঁর সঙ্গ ছাড়েন নি একেবারেই। সর্বক্ষণই তিনি কুমারের গতিবিধি লক্ষ্য করতে থাকেন, কিন্তু কিছুই পান না ধরবার মত। মন্ত্রী যত রকমে সম্ভব চেষ্টা করছেন রাজপুত্রের মধ্যে বিশেষ ভাবে শিকারের ইচ্ছে জাগাতে, কুমারের কিন্তু সেদিকে কোনও উৎসাহই দেখা যাচ্ছে না।

মন্ত্রী অবশ্য নাছোড়বান্দা। কুমারকে কত রকমেই না

বোঝাচ্ছেন যে মৃগয়াটা রাজধর্ম; বহুকাল ধ'রে এটা পুরুষানুক্রমে চলে আসছে; মৃগয়ায় যাদের উৎসাহ নেই, তাদের কাপুরুষ ব'লে লোকে শ্রদ্ধা করে না। তাই কুমারের এ যাত্রায় কিছু-না-কিছু শিকার করা উচিত। তা-ছাড়া, কুমার শিকার না করলে এত উদ্যোগ-আয়োজন সবই যে একেবারে বৃথা হয়ে যাবে। এ-সব শুনেও কুমার কিন্তু যেমন ছিলেন তেমনিই রইলেন, তাঁর কোনও বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। মন্ত্রী এবার যেন অনেকটা দমে গেলেন। ফিরে গেলে মহারাজের কাছে কি ব'লে তিনি কৈফিয়ৎ দেবেন? যাহোক্, তবু তিনি হাল ছাড়লেন না।

এমনি ক'রেই সেদিনটা কাটল। পরের দিন তিনি কুমারকে জিজ্ঞাসা করলেন,—তবে কি আমাদের ফিরেই যেতে হবে, কুমার? শিকার-টিকার কি কিছু করা হবে না? কুমার নিরুত্তর; কোনো শব্দই বেরুল না তাঁর মুখ থেকে। অবশেষে মন্ত্রীমশাই নিরাশ হয়ে সকলকে ব'লে দিলেন যে, সেদিন সেখানেই রাতটা কাটিয়ে, পরের দিন সকাল হ'লেই ফিরে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে। সেই মতই ব্যবস্থা হ'তে লাগল। কুমার ছাড়া আর সকলেই কিন্তু নিরাশ হয়ে পড়ল—বৃথা হল মৃগয়ার এত আয়োজন। মন্ত্রী সব দেখে এবার অন্য সুর ধরলেন,—কাকুতি, মিনতি, স্তুতি আরম্ভ করলেন। এতবড় একটা রাজ্যের মন্ত্রী তিনি, কুমারকে কথা কওয়াবার জন্যে তাঁর এরকম ব্যগ্রতা দেখে কুমার বড় কম আশ্চর্য হ'লেন না। যাহোক্ পরের দিন তাঁদের দল ফিরতে সুরু ক'রে দিলে। যান-বাহন সব ঘরমুখো চালানো হ'ল। রাজধানীতে পৌঁছুতেও তো একটা দিন লাগবে; এদিকে মন্ত্রীমশাইয়েরও অনুনয়-বিনয়ের বিরাম নাই।

—তিন—

মাঝপথে দেখা গেল ক্রমে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে আস্‌ছে। হয় এখনি ভীষণ ঝড় উঠবে, না হয় বৃষ্টি আসবে। এখন আশ্রয়ের দরকার। ক্রমে চারিদিক কালো হয়ে এল। দেখা গেল, অল্প দূরে বহুকালের একটা বিশালকায় বটগাছ। যুবরাজ ও মন্ত্রীমশাই একখানি রথে আগেই ছিলেন। সেই বটগাছের ধারেই রথ রাখতে হুকুম করলেন তাঁরা। চারিদিক তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। এই আসন্ন দুর্যোগে কতকগুলো বক সেই প্রকাণ্ড গাছের ওপরকার একটা ডালে আশ্রয় নিয়েছিল। এখন, এই শিকারীর দলের রথের চাকার ঘর্ঘর শব্দ, হাতীর গলার ঘণ্টার ধ্বনি, এতগুলো ঘোড়ার চলার আওয়াজ—এই সবে ভয় পেয়ে গাছের বকগুলো কলরব ক'রে উঠল, যেন তারা বলতে চাইল, "ওগো শিকারীর দল, আমরা নিরীহ কতকগুলো বক রয়েছি এখানে। তোমাদের হাঁকডাকে বড্ড ভয় পেয়ে গেছি আমরা।"

তাদের কলরব শুনে মন্ত্রীমশাই আর অন্য অন্য শিকারীদের নজর পড়ল সেই গাছের ডালের দিকে। তাঁরা দেখলেন—চমৎকার ত'! হাতের কাছেই এত সব শিকার! রাজকুমারকে কথা বলাবার চেষ্টা খানিকক্ষণ বন্ধ রেখে ধনুর্বাণ বাগিয়ে নিয়ে মন্ত্রীমশাই নামলেন রথ থেকে। তারপর সুবিধেমত জায়গা বেছে নিয়ে ধনুকে তীর জুড়ে লক্ষ্য করলেন গাছের ডালে। ঝুপ্‌ ঝুপ্‌ ক'রে দুটো নিরীহ প্রাণী পড়ল মাটির বুকে—নিরীহের রক্তপাতের লজ্জায় ধরণী উঠলেন রাঙিয়ে, তীক্ষ্ণ একটা আর্তনাদ তীরের মত বিদ্ধ হ'ল আকাশের বুকে। সেদিকে কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই মন্ত্রীমশাইয়ের। লক্ষ্যভেদের সাফল্যে

নাচতে নাচতে পাখী দুটো তুলে নিয়ে গিয়ে দেখালেন কুমারকে,—রাত্রের ভোজের কি রকম সুন্দর ব্যবস্থা করা হয়েছে! কুমার অবশ্য আগাগোড়াই মন্ত্রীমশাইয়ের কাণ্ড-কারখানা দেখছিলেন। কিন্তু মনে তাঁর যাই থাকুক্ না কেন, এতক্ষণ মুখের ভাবে কোনো রকম অসন্তোষ প্রকাশ করেন নি তিনি। কিন্তু চোখের সামনে এই নিরীহ পাখী দুটোর ধড়ফড়ানি দেখে তাঁর দু'চোখে যেন ব্যথা এল ঘনিয়ে—একবার মাত্র করুণ দৃষ্টিতে চাইলেন মন্ত্রীর মুখের পানে, তারপর অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রইলেন। রথ থেকে তিনি নামলেন না দেখে মন্ত্রী আবার গিয়ে তাঁর পাশে ব'সে তাঁকে কথা বলাবার জন্যে আগের মতই আবার উপরোধ-অনুরোধ সুরু ক'রে দিলেন।

"একটা কথা বল কুমার, আমার একটা অনুরোধ রাখ। আমি তোমার বাপের চেয়ে বয়সে বড়, তোমার ছেলেবেলা থেকে কেবল তোমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আর কল্যাণই চিন্তা করেছি। আমার কথা একটা রাখ, এভাবে আমাকে অপমান কোরো না। এ রাজ্যে সামান্য প্রজা থেকে মহারাজ অবধি আমার কথা কে না শোনে বল! আমি তোমায় আজ যে-রকম অনুরোধ কচ্ছি, আমার জীবনে এতটা আমি আর কাওকে করিনি। আচ্ছা, তুমি একটা কথা বল, আর কখনও আমি তোমায় কথা বলতে অনুরোধ করব না—শুধু একটিবার আমার মান রেখে একটা কথা বল।"

একটা কথা বললে আর কখনও অনুরোধ করবেন না—মন্ত্রী যখন বারবার এই কথা বললেন, তখন রাজকুমার প্রসন্ন হয়ে একটিমাত্র কথা বললেন। তবে যে কথাটি তিনি বললেন সেটি অমূল্য, তার তুলনা নেই। তিনি হাসিমুখে বললেন, "দেখুন, মন্ত্রীমশাই, কথা বলার জন্যেই না এই নিরীহ প্রাণী দু'টি আপনার বাণের আঘাতে

প্রাণ দিল? কথা বলার কত দোষ দেখলেন ত'! আজ ঐ পাখী দু'টির যা ঘটল, কাল হয়ত আপনার বেলাও তা' ঘটতে পারে। অতএব, আর কথা বলবেন না। পাখীগুলো যদি কলরব ক'রে না উঠত, তাহলে ত' ওরা মারা পড়ত না।"

এই কথাটায় কুমার মন্ত্রীকে দেখিয়ে দিতে চাইলেন যে, সময়-বিশেষে কথা বলার পরিণাম কতটা ভয়াবহ হ'তে পারে। আজ যেটা পাখী সম্বন্ধে ঘটল, কাল হয়ত তাঁর নিজের সম্বন্ধেও তাই ঘটতে পারে। কিন্তু মন্ত্রী এই মহামূল্য কথাটির মর্ম বুঝলেন না। কুমারের এই ছোট্ট কথাটিতে যে কি ইঙ্গিত ছিল তা না বুঝে, কুমার যে কথা কয়েছেন এই আনন্দে ও উত্তেজনায় তিনি অধীর হয়ে উঠলেন। আত্মহারা হয়ে মন্ত্রী সেইখান থেকেই রটাতে আরম্ভ করলেন যে, কুমার তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন। তাঁর জেদও বজায় রয়েছে, তার ওপর মহারাজের পুরস্কার ত' আছেই শেষ পর্যন্ত—এই ভেবে মন্ত্রী আনন্দে যেন উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। এখন তাঁর প্রধান কাজ হ'ল যত শীঘ্র সম্ভব এ-খবর মহারাজকে দেওয়া। রথে ব'সে ব'সে তিনি শুধু ভাবতে লাগলেন, কতক্ষণে রাজধানীতে পৌঁছোনো যায়।

এদিকে কথা কানে হাঁটে। সারা পথটায় রাজকুমারের কথা বলার খবরটা প্রচার করার ফলে, যখন তাঁরা রাজধানীতে এসে পৌঁছুলেন তখন দেখা গেল যে রাজপ্রাসাদের বাসিন্দারা ছাড়া আর কারো এ-খবর জানতে বড় বাকী নেই।

প্রাসাদে পৌঁছেই মন্ত্রী মহারাজের খোঁজ করলেন; ইচ্ছেটা—নিজে গিয়ে তাঁকে কুমারের কথা-বলার খবরটা জানাবেন। মহারাজের মহলে গিয়ে শুনলেন, মহারাজ ভ্রমণে বেরিয়েছেন। এ খবর পেয়েই

তিনি না ভেবে চিন্তে একেবারে মহারাণীর মহলে গিয়ে উঠলেন। মন্ত্রীর ব্যস্ত-সমস্ত ভাব ও উত্তেজনা দেখে প্রহরী, দৌবারিক সকলে পথ ছেড়ে দিলে। মহারাণীর সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করলেন, এবং আনন্দে চতুর্মুখ হয়ে তাঁর সঙ্গে কুমারের বাক্যালাপের কথা বললেন। এই সুখবর পেয়ে মহারাণী খুশী হয়ে একটি মহামূল্য রত্ন অঙ্গুরীয় তাঁকে পুরস্কার দিলেন। আনন্দে গদগদ হয়ে তিনি তখন নিজের বাড়ীতে চলে গেলেন,—উত্তেজনার বশে এ-কথাটা একবারও ভাববার অবসর পেলেন না যে, বিপদের সময় ছাড়া মহারাণীর মহলে প্রবেশের অধিকার তাঁর একেবারেই ছিল না। মহারাণীর কাছ থেকে যখন তিনি বাড়ী ফিরলেন তখনও কিন্তু এ-কথাটা তাঁর মাথায় ঢোকেনি—কুমারের কথা কওয়ানোর ব্যাপারে তাঁর ভেতরে সবই যেন ওলট-পালট হয়ে গিয়েছিল।

—চার—

যাই হোক, যথাসময়ে ভ্রমণ শেষ ক'রে মহারাজ প্রাসাদে ফিরলেন। অন্তঃপুরে মহারাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ামাত্রই তিনি কুমারের কথা বলার খবরটা শুনলেন। মহারাণী কেমন ক'রে এই খবরটা পেলেন, মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন মহারাণীকে। রাণী বললেন যে, মন্ত্রীমশাই নিজেই তাঁকে এই খবরটি দিয়ে গেছেন, সুতরাং এতে ভুল হবার কোনও সম্ভাবনা নেই।

আশ্চর্য হয়ে মহারাজ বললেন, "সে কি! রাজ-অন্তঃপুরে ত' মন্ত্রীর প্রবেশাধিকার নেই!" মহারাণী বললেন, "তা ত' নেই। কিন্তু কুমারের জন্যে আমরা ত' প্রথম থেকেই বিশেষ চিন্তিত;

তার কথা শোনবার জন্যে আমরা উদ্বিগ্ন ছিলাম, সেই জন্যই বোধ হয়...”

বাধা দিয়ে মহারাজ বললেন,—“নাঃ, আমার মনে হয় ওটা রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশের একটা অছিলামাত্র। আসলে মন্ত্রীর নিশ্চয়ই অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল। অবশ্য, কুমারের কথা-বলা সম্বন্ধে এ-ধরণের একটা খবর আমিও প্রাসাদে ফেরার পথে পেয়েছি বটে; কিন্তু প্রাসাদে ফিরে কুমারের মহলে খোঁজ নিয়ে জানলাম যে, এসে অবধি কুমার কারো সঙ্গেই কথা কননি—ঠিক আগেকার মতই মৌনী রয়েছেন। তাই, আমার মনে হয়, এই খবরটা আসলে মন্ত্রীরই কারচুপি!”—এই ব'লে মহারাজ রাগত-ভাবে তখনই বা'র-মহলে তাঁর নিজের ঘরে চ'লে এলেন, আর মন্ত্রীমশাইয়ের কাছে পাঠালেন জরুরী তলব। মন্ত্রীমশাই তখন আহ্নিকে বসেছিলেন; মহারাজের জোর তলব পেয়ে সন্ধ্যা-আহ্নিক ফেলে রেখে রাজ-প্রাসাদের দিকে ছুটলেন। মনে মনে অনুমান করতে করতে এলেন—হয়ত মহারাণীর কাছে খবরটা শুনে মহারাজ খুশী হয়ে পুরস্কার দিতেই ডাকছেন। আর, কিভাবে কি কি কথাবার্তা কুমারের সঙ্গে হয়েছে তাই জানবার জন্যেই বোধ হয় তিনি ব্যাকুল হয়েছেন; তাই বোধ হয় এই জরুরী তলব।

যাই হোক রাজপ্রাসাদে প্রবেশমাত্রই মন্ত্রী দেখলেন—মহারাজের মুখ মোটেই প্রসন্ন নয়। মন্ত্রী অভিবাদন ক'রে কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই মহারাজ গম্ভীর ভাবে বললেন, “মন্ত্রীমশাই, কুমার যে আপনার সঙ্গে কথা বলেছেন এর পর্যাপ্ত প্রমাণ যদি কাল সূর্যাস্তের মধ্যে দিতে না পারেন, তা হলে কাল রাত্রিশেষে বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে আপনাকে বধ করা হবে।”—

আর কোনও কথা না ব'লে মহারাজ তৎক্ষণাৎ অন্য দিকে চলে গেলেন।

মন্ত্রীমশাই ত' একেবারে অবাক্, তাঁর মাথা ঘুরে উঠল। তাঁর চোখের সাম্‌নে যেন গাঢ় অন্ধকার ঘনিয়ে এল। কতক্ষণ পরে, একটু সাম্‌লে, তিনি সেইখানেই ব'সে পড়লেন। ভাবনার অকূল সমুদ্র তাঁর ভেতরটাকে যেন তোলপাড় করতে লাগল। প্রথমেই তাঁর মনে হ'ল—সব চেয়ে বড় বিপদ এই যে রাজপুত্র যে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন তার কোন প্রত্যক্ষ সাক্ষী ত' তাঁর নেই। একটি মাত্র কথাই তাঁর সঙ্গে কুমারের হয়েছে, কিন্তু আর কেউ ত' শোনেনি সে-কথা। অতএব এ-বিপদ থেকে তাঁকে উদ্ধার করতে পারেন একমাত্র কুমার নিজে, কিন্তু সেদিকেও ত' কোন আশা-ভরসা দেখা যাচ্ছে না। কেননা, অনেক কাকুতি-মিনতি অনেক অনুনয়-বিনয়ের ফলে, ভবিষ্যতে আর কখনও কথা বলবার জন্যে কোনো অনুরোধ করা হবে না এই সর্তে, তবেই না কুমার মাত্র একটি কথা বলেছেন। তা'ছাড়া কুমার যেরকম দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, আর ত' কিছুতেই তাঁকে দিয়ে কথা বলানো যাবে না। আর একটা বিপদ হ'ল এই যে, কি কথাটা কুমার তাঁকে বলেছিলেন তাও তাঁর একেবারেই মনে নেই। শুধু তিনি যে কথা বলেছিলেন এইটুকুই তাঁর মনে আছে। এ বিপদে এখন কি করা যায়?—মন্ত্রীমশাই ব'সে ব'সে ভাবতে লাগলেন। কিন্তু কোন কূল-কিনারাই দেখতে পেলেন না। পৃথিবীটা তাঁর কাছে মনে হ'তে লাগল যেন গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা, এক ফোঁটা আলোও যেন কোনখানেই নেই—শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার! তাঁর সমস্ত অন্তর মথিত ক'রে শুধু একটা ব্যাকুল প্রার্থনা বেরিয়ে এল—"হে ভগবান, রক্ষা কর!" এবার নিশ্চিত মৃত্যু—মন্ত্রীমশাই একেবারে

হতাশ হয়ে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত আর কোনও উপায় ঠিক করতে না পেরে মন্ত্রীমশাই আবার রাজকুমারের শরণাপন্ন হবার সিদ্ধান্তই করলেন। কুমারের কাছে গিয়ে সব কথাই তিনি অকপটে বললেন।

শেষে অত্যন্ত কাতর হয়ে জোড় হাতে নিবেদন করলেন, "কুমার, আর একবার তুমি কথা না বললে কাল রাত্রিশেষেই আমার প্রাণ যাবে—এই মহারাজের আদেশ। এ-বিপদ থেকে একমাত্র তুমিই আমায় রক্ষা করতে পার।"—ব'লেই অত বড় যে বিচক্ষণ মন্ত্রী হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠে কুমারের দু'হাত জড়িয়ে ধরলেন আপনার দু'হাত দিয়ে।

বুদ্ধিমান্ রাজকুমার সমস্ত ব্যাপারটাই বুঝলেন,—মন্ত্রীকে তখন তিনি আবার একটি কথা বললেন,—"দেখুন মন্ত্রীমশাই, বেশী কথা বলার কত দোষ! আপনি যদি এত কথা না বলতেন, তা' হ'লে এ-সব কিছুই ঘটত না। মনে ক'রে দেখুন দেখি, কাল আপনাকে আমি বলিনি কি যে, আজ পাখীর ব্যাপারে যা ঘটল কাল আপনারও তাই ঘটতে পারে?"

তখন মন্ত্রীমশাইয়ের সব কথাই মনে পড়ল; কুমারের কথার যথার্থ মর্ম্মও তিনি তখন বুঝতে পারলেন।

"হায়, হায়, কাল যদি এ-কথাটা বুঝতাম!"—এই কথা মনে ক'রে মন্ত্রীমশাই কেঁদে উঠলেন,—আর কুমারের পায়ে আছড়ে পড়লেন। তখন কুমার তাঁকে ধ'রে তুলে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আশ্বস্ত করলেন। যাই হোক, মন্ত্রীমশাইয়ের প্রাণরক্ষা করতে কুমার পর্য্যাপ্ত প্রমাণই দিলেন। মন্ত্রীমশাই ত' সে যাত্রায় বেঁচে গেলেন। রাজ-রোষ থেকে অব্যাহতি পেয়ে মন্ত্রী বাক্-সংযমের মাহাত্ম্য

বুঝলেন,—এমন ভাবে বুঝলেন যে, তিনি যতদিন বেঁচেছিলেন কেউ আর তাঁকে কথা বলতে শোনেনি।

এই গল্পের ব্যাপারটা অবশ্য ঘটেছিল সেকালে। কিন্তু তা' ব'লে এর শিক্ষাটা কিছু আর একালে মিথ্যে হয়ে যায়নি। অনেক বেশী আর বাজে কথা বলা সেকালেও যেমন ক্ষতির কারণ ছিল আজও তেমনিই আছে, বরং আরো বেশী ক্ষতিকর হয়ে উঠেছে ব'লেই আমাদের ধারণা—তাই নয়কি?

—এক—

মহারাজের ঐশ্বর্য-সম্পদ বহু-বিস্তৃত থাকলেও যে-ব্যক্তির সে-সমস্ত নখদর্পণে থাকে, মহারাজের শুভাশুভ-চিন্তায় যিনি অষ্টপ্রহর ব্যস্ত, রাজ্যের কুশল, প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য—অবিরাম এ-সমস্ত বিষয়ে যিনি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে পারেন, তিনিই যথার্থ মন্ত্রী। এমনই একটি মন্ত্রী ছিল মহারাজ পরন্তপের। মহারাজ যেমন শৌর্যবীর্যশালী, প্রবল-পরাক্রান্ত ও বিচক্ষণ ছিলেন, মন্ত্রীও ছিলেন ঠিক তাঁরই উপযুক্ত। ঈশ্বরের প্রতি মন্ত্রীর ছিল অবিচল বিশ্বাস, অগাধ ভক্তি। তিনি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করতেন যে, মানুষের সমস্ত দুর্ভাগ্য-সৌভাগ্যের মূলেই সৃষ্টিকর্তার একটা মঙ্গলময় উদ্দেশ্য রয়েছে। এ-সত্য তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করতেন, সেই জন্য রাজ্যে সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করত আর সবাই জানত যে তাঁর তুল্য স্থিরবুদ্ধি আর বিচক্ষণ সে-রাজ্যে অন্য কেউ ছিল না।

মহারাজের সঙ্গে কিন্তু একটি বিষয়ে তাঁর মতের মিল ছিল না। মানুষের সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্যের মূলে যে ঈশ্বরের মঙ্গলময় উদ্দেশ্য

রয়েছে—এ-কথাটা মহারাজ বিশ্বাস করতে চাইতেন না। কারণ, কথাটা যে তাঁর পৌরুষে আঘাত করত! পুরুষকারের চেয়ে দৈব যে বেশী শক্তিশালী—এ-কথা যে কাপুরুষেরা বলে! যাই হোক্, এ-নিয়ে মন্ত্রীমশাইয়ের সঙ্গে তাঁর কোনও দিন বাগ্‌বিতণ্ডা বা কথা-কাটাকাটি হয়নি; কারণ, মহারাজ ছিলেন বড়ই সাবধান আর সংযতবাক্। বিচক্ষণ মন্ত্রীও এ-নিয়ে কখনও তর্ক ওঠাতেন না। তিনি নিশ্চিত জানতেন, প্রজ্বলিত দিবাকরের মতই এ-সত্য এক সময় না এক সময় অহং-ভাবের অন্ধকার আর অবিশ্বাস ঘুচিয়ে মহারাজের মন আলোয় উদ্ভাসিত করবেই।

হয়ত খবর এল—অমুক স্থানে জলপ্লাবনে বিস্তর ক্ষতি হয়েছে। মহারাজ মন্ত্রীর দিকে সপ্রশ্ন-দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন; তখন মন্ত্রী বললেন, "মহারাজ! একে ভগবৎ-কৃপা ব'লেই মনে করবেন।" অবশ্য, এ-ব্যাপারে কর্তব্য-পালনের কোনো ত্রুটিই হ'ল না,—কিন্তু তবুও মহারাজের সন্দেহ এইখানেই, যথার্থই এটা ভগবৎ-কৃপা কি না।

হয়ত সেবার রাজকর আশার অতিরিক্ত আদায় হয়েছে, প্রজারা প্রচুর ধনধান্য উপার্জন করতে পেরেছে, ব্যবসা-বাণিজ্যেও প্রচুর অর্থাগম হয়েছে। মন্ত্রী বললেন,—"মহারাজ! এও ভগবৎ-কৃপা ব'লেই জানবেন।"

আবার, কোন সময়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে হয়ত খবর এল,—যুদ্ধে পরাজয় হয়েছে, বিস্তর রসদ লুট হয়ে গেছে, সেনাপতি রণক্ষেত্রে প্রাণ হারিয়েছেন। মন্ত্রী বললেন,—"মহারাজ, এ-সবই ভগবৎ-কৃপা ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে, কর্তব্য ভুললে চলবে না, আমাদের অগ্রসর হ'তেই হবে।"

আবার যখন সংবাদ আসে—অমুক স্থানে বিদ্রোহ হয়েছে; প্রজারা কর ত' দেয়ই নি, উপরন্তু রাজকর্মচারীদের ওপর অত্যাচার করেছে,—তখনও মন্ত্রী বলেন, "মহারাজ, এ-সব তাঁরই কৃপা; তা' ছাড়া আর কি হ'তে পারে? তবে, দুবুদ্ধির প্রভাব থেকে প্রজাদের রক্ষা করা ত' রাজারই দায়িত্ব!"

আবার অন্য সময় যখন খবর আসে—নূতন দেশ জয় হয়েছে, অনেক ধনাগম, অনেক অনেক দ্রব্যসম্ভার রাজকোষভুক্ত হয়েছে, মন্ত্রীর তখনও সেই একই কথা, "মহারাজ, ভগবৎ-কৃপা ছাড়া এ-সব আর কিছুই নয়।"

মহারাজের মনের সংশয় কিন্তু যায় না—যা' সব ঘটছে, যথার্থই কি এ-সব ভগবৎ-কৃপা? সত্য সত্যই কি এর পেছনে সৃষ্টিকর্তার কোনো মঙ্গলময় উদ্দেশ্য আছে?

—দুই—

যাই হোক্, এই ভাবে মন্ত্রীকে নিয়ে মহারাজের জীবনের অনেক কালই কাটল। একবার মহারাজের ইচ্ছে হ'ল—মৃগয়ায় যাবেন। মহারাজ মন্ত্রীকে ডেকে তাঁর অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। মন্ত্রী বললেন, "মহারাজ, এও ভগবৎ-কৃপা ব'লেই জানবেন।" মহারাজ শুনে অবিশ্বাসের হাসি হাসলেন।

যাই হোক্, সৈন্য-সামন্ত, মৃগয়ার উপযুক্ত নানা দ্রব্যসম্ভার সঙ্গে

নিয়ে মহারাজ ত' মৃগয়ায় চললেন। রাজ্যের প্রান্তে নিবিড় বন, বহু জন্তু-জানোয়ারের বাস। মহারাজ এই বনটাকেই মৃগয়ার জন্যে বেছে নিলেন। তারপর সৈন্য-সামন্ত রেখে দিয়ে তাঁবু-টাবু খাটাতে ব'লে, কেবলমাত্র মন্ত্রীকে নিয়ে মহারাজ বনের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

অল্প কতক্ষণ পরেই সন্ধ্যা হয়ে যাবে। মহারাজ ভাবলেন, এর মধ্যে কিছু শিকার করতেই হবে,—একটা জেদ চ'ড়ে গেল মহারাজের মাথায়। শিকার চাই-ই। এই ভেবে মহারাজ দ্রুত পা ফেলে চলতে লাগলেন। বন ক্রমশঃ ঘন হ'তে লাগল। বড় বড় গাছ, ছোট ছোট গাছ, কাঁটা গাছও আছে। মহারাজের কিন্তু গ্রাহ্য নেই।

মহারাজের এই রকম দ্রুত পদক্ষেপের সঙ্গে মন্ত্রী ঠিক তাল রাখতে পারছেন না। তবুও যতটা সম্ভব দ্রুত চলেছেন।

এদিকে, মহারাজের লক্ষ্য শিকার আর মন্ত্রীর লক্ষ্য মহারাজ। মহারাজ দ্রুত চলেছেন—কোথায় শিকার, কোথায় শিকার ক'রে—পথের দিকে দৃষ্টি নেই একেবারেই। একটা প্রকাণ্ড গাছের নীচে দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ ধারালো একটা পাথরের সঙ্গে প্রচণ্ড সংঘর্ষে মহারাজের পায়ে একটা ভীষণ আঘাত লাগল। দেখা গেল, পায়ের একটা আঙ্গুলের নীচেকার খানিকটা মাংস একেবারে ছিঁড়ে গিয়ে ঝুলছে। সহজভাবে চললে এতটা লাগবার কথা নয়, কিন্তু মহারাজ এত বেগে চলছিলেন যে সেই বেগের প্রবলতায়, অস্থিমাংসগঠিত আঙ্গুল ত' ছার, যদি লোহার মত কঠিন বস্তুতেও ঐ পাথরের মত কোন কিছুর আঘাত লাগত তা' হ'লে সেটাও বিদীর্ণ হয়ে যেত।

এই ভাবে প্রবল আঘাত পেয়ে 'পা'টিকে তু'লে ধ'রে মন্ত্রীকে ডেকে মহারাজ বললেন—"দেখো মন্ত্রী—কি সাংঘাতিক আঘাত পেলাম!" মন্ত্রী দেখলেন যে, মহারাজের পায়ের কড়ে আঙ্গুলটার

নীচে খানিকটা মাংস ঝুলছে, আর রক্তের স্রোত বইছে সেখান থেকে। মন্ত্রী বললেন, "মহারাজ, এও ভগবৎ-কৃপা ব'লেই জানবেন।" তারপর নিজের উত্তরীয়-প্রান্ত ছিঁড়ে ক্ষত স্থানটা বেঁধে দিতে লাগলেন।

কিন্তু এতদিন যে-কথাটা মহারাজ স্থির হয়ে শুনে এসেছেন—কখনও কোনও প্রতিবাদ করেন নি—এবার, এ-সময়ে, তা' তিনি সহ্য করতে পারলেন না। ক্রোধে আরক্ত-চক্ষু, জ্ঞানশূন্য হয়ে, পরুষবাক্যে, অতি কঠোর স্বরে মন্ত্রীকে বললেন,—"এও ভগবৎ-কৃপা! বটে! তবে যাও, ভগবৎ-কৃপায় ঐখানে যাও।"—ব'লে মন্ত্রীকে তাঁর সেই বিশাল বাহু দিয়ে এমন জোরে এক ধাক্কা দিলেন যে মন্ত্রী ছিট্‌কে পথের ধারের এক গভীর খদের মধ্যে গিয়ে পড়লেন। কোথায় যে তলিয়ে গেলেন কিছুই দেখা গেল না।

মহারাজের রক্ত তখনও গরম রয়েছে—বৃদ্ধ মন্ত্রীকে এইভাবে ফেলে দিয়েও তিনি ভ্রূক্ষেপ করলেন না, ঝোঁকের মাথায় চলতে লাগলেন পায়ের সেই দারুণ আঘাত নিয়েও।

ক্রমে অন্ধকার হয়ে এল, মেজাজও তাঁর অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। তিনি ভাবতে লাগলেন—এখন কি করা যায়? ফিরে যে যাবেন তারও সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছেন না; কেননা, উত্তেজনার বশে, শিকার-সন্ধানে অনেকটাই চ'লে এসেছেন, এখন আর পথও চিনে উঠতে পারছেন না! যাক্, না হয় এই বনেরই কোনো একটা গাছে চ'ড়ে রাতটুকু কাটানো যাবে,—এই ভেবে একটা বেশ বড় গোছের গাছের সন্ধানে এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন।

ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। সারা বন অমাবস্যার অন্ধকারে ছেয়ে গেল—সেই গাঢ় অন্ধকার ভেদ ক'রে দৃষ্টি আর চলে না। মহারাজ

মহারাজ দেখলেন একদল লোক মশাল হাতে তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছে। (পৃঃ ২৫)

যে বৃক্ষে আশ্রয় করবেন মনে করেছিলেন, তার নীচে এসে কত কি ভাবতে লাগলেন। এমন সময় দূরে যেন আলো দেখা গেল। মহারাজ কুতূহলী হয়ে সেই দিকে দেখতে লাগলেন। ক্রমে সেই আলো নিকটবর্তী হ'তে মহারাজ দেখলেন, একদল লোক মশাল হাতে তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছে। মহারাজ একবার ভাবলেন—বোধ হয় তাঁরই দলের লোকেরা তাঁর অনুসন্ধানে বেরিয়েছে। আশায় ভর ক'রে তিনি সাগ্রহে তাকিয়ে রইলেন সেই দিকে। কিন্তু যখন তারা কাছাকাছি এল, তখন বুঝতে পারলেন—তারা দস্যু, তাঁর দলের লোক নয়। তাদের দলে লোক প্রায় ৫০ জন হবে।

ডাকাতেরা মহারাজকে দেখেই চীৎকার ক'রে উঠল—পাওয়া গেছে রে, খুব ভাল একটা শিকার পাওয়া গেছে। আজ অমাবস্যে, জগদম্বার কৃপায় হ'ল ভাল—ব'লেই মহারাজের কাছে এসে তাঁকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেললে। মহারাজের তখন আর এমন শক্তি ছিল না যা দিয়ে এই প্রবল দস্যুদলকে প্রতিরোধ করেন। বেশ ক'রে মহারাজকে বেঁধে উল্লাসে চীৎকার করতে করতে তারা তাঁকে নিয়ে চলল।

—তিন—

দূরে গভীর বনের মধ্যে এক বিশাল কালীমূর্তির কাছে তারা তাঁকে নিয়ে গেল। সেখানে অনেকক্ষণ বাঁধা অবস্থায় মহারাজ প'ড়ে রইলেন। নিশীথ রাত্রে পূজোর পর কাপালিক পুরোহিত মহারাজের বাঁধন খুলে, তাঁকে স্নান করিয়ে আনতে আদেশ দিলে। তখন সকলে মিলে তাঁকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে স্নান করিয়ে আনলে।

উৎসর্গ করবার সময় পূজারী মহারাজের মুখের দিকে চেয়ে রাজচিহ্ন দেখে মহা খুশী হয়ে বললে,—আহা, মা জগদম্বা প্রসন্ন হয়ে এমন বলিই জুটিয়ে দিয়েছেন রে! অনেকদিন এমন বলি পাওয়া যায় নি। নরবলির অনুষ্ঠানে রাজাই হ'লেন সর্বোত্তম বলি, যেহেতু রাজা হ'লেন নরপতি।

যাক্, যথাসময়ে বলি উৎসর্গ করা হ'ল, খড়্গও উৎসর্গ করা হ'ল; কাপালিক তখন বললে,—যা, এইবার নিয়ে যা রে।

মহারাজকে যূপকাষ্ঠের কাছে নিয়ে যাওয়া হ'ল। যূপকাষ্ঠ পূজো করা হ'ল। এইবার মহারাজকে হাত-পা বেঁধে যূপকাষ্ঠে ফেলা হবে। কিন্তু পা বাঁধতে গিয়ে হঠাৎ দেখা গেল, বলির পায়ের একটা আঙ্গুল কাটা।

যাঃ, এমন বলিটাও হাত ছাড়া হ'ল রে! এর যে ক্ষত রয়েছে! দে দে একে ছেড়ে দে।—কাপালিক চেঁচিয়ে উঠল। তারপর মহারাজকে উদ্দেশ ক'রে বললে—যাও বাপু, তুমি চলে যাও। তোমাকে আমরা ছেড়েই দিলাম।

মহারাজ চম্‌কে উঠলেন। তারপর আস্তে আস্তে ব'সে পড়লেন। এ কী ব্যাপার!—প্রাণের ভেতর গুরু গুরু ক'রে উঠল; মন্ত্রীর শেষ কথাটা কেবলই কানের ভেতর এই আওয়াজ তুলতে লাগল—"মহারাজ,—এও ভগবৎ-কৃপা ব'লেই জানবেন।"

মহারাজ নির্বাক্। এতক্ষণ তাঁর মুখ বেশ প্রফুল্ল ছিল, কিন্তু যেই শুনলেন—এর খুঁৎ আছে, একে বলি দেওয়া হবে না, ছেড়ে দাও একে—অমনি মহারাজের মুখে বিষাদের ছায়া স্পষ্ট ফুটে উঠল।

এবার মৃত্যু নিশ্চিত—এতক্ষণ মহারাজ এই ধারণাই ক'রে রেখেছিলেন। কোনও প্রতিবাদও করেন নি। মনে মনে জগদম্বাকে

স্মরণ ক'রে নিশ্চিন্ত হয়েই বসেছিলেন। কেননা, এ-সব তিনি নিজেই ঘটিয়েছেন,—কাকেও ত' দোষ দেবার নেই।

কিন্তু যখন শুনলেন যে, পায়ের আঙ্গুল কাটা ব'লে তিনি মুক্তি পেলেন—তখন তাঁর মনের মধ্যে যে কী অবস্থা হ'ল, তা' আর বলবার নয়। ভাষায় সে ভাব প্রকাশ করা যায় না। বহুক্ষণ তিনি মুহ্যমান হয়ে ব'সে রইলেন—মুখে একটিও কথা নেই। সমস্ত রাত তিনি এইভাবে ছিলেন। ভোরের হাওয়া গায়ে লাগতে তাঁর চমক ভাঙল। মহারাজ তখন উঠে আবার চলতে শুরু করে দিলেন।

—চার—

পাগলের মত মহারাজ বনে বনে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। মন্ত্রী! কোথায় মন্ত্রী?—ব'লে চীৎকার ক'রে ডাকতে ডাকতে মহারাজ চললেন—মন্ত্রী, মন্ত্রী, কোথায় মন্ত্রী?

বেলা এক প্রহর হ'তে চলল; মহারাজের অনুসন্ধানের বিরাম নেই—মন্ত্রী, মন্ত্রী, কোথায় তুমি? উত্তর দাও।—অনেকক্ষণ পরে খদের দিক থেকে মহারাজ সাড়া পেলেন,—এই যে মহারাজ, ভগবৎ-কৃপায় আমি এইখানেই আছি। স্বর লক্ষ্য ক'রে মহারাজ সেই গভীর খদের মধ্যে নেমে গেলেন। অনেক আয়াসে অনেক আদরে তুললেন মন্ত্রীকে। সহানুভূতি-ভরা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—কোথাও আঘাত লেগেছে কি, বন্ধু?

কোথাও লাগেনি, মহারাজ—ভগবৎ-কৃপায় আমি সম্পূর্ণ অক্ষতই রয়েছি!—বললেন মন্ত্রী।

রাজা বললেন—মন্ত্রী, তোমার কথা যে সম্পূর্ণ সত্য তা আমি

এতদিনে বুঝতে পেরেছি, এতদিনে বিশ্বাস করেছি যে ভগবৎ-কৃপাতেই আমি সেদিন আঘাত পেয়েছিলাম।—এই ব'লে মন্ত্রীকে সমস্ত ব্যাপার খুলে জানালেন। মন্ত্রী শুনে আনন্দে অধীর হয়ে বললেন,—মহারাজ, আমি যে এই গর্তে পড়েছিলাম, তাও ভগবানের কৃপাতেই। ভেবে দেখুন প্রভু, যদি কাল রাত্রে আপনার সঙ্গে থাকতাম তা' হ'লে নিঃসন্দেহে আমাকেই আপনার বদলে যূপকাষ্ঠে প্রাণ দিতে হ'ত। তাই কৃপা ক'রে এই গহ্বরে ফেলে ঈশ্বর আমার এই তুচ্ছ প্রাণ রক্ষা করেছেন।

মহারাজ ও বিচক্ষণ মন্ত্রী তখন একান্ত বন্ধুর মতই দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ হয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন।

ঈশ্বর-কৃপা, মহারাজের মনের অহং-কার দূর ক'রে দিলে।

—এক—

অতি প্রাচীন কালের কথা। প্রাচীন কাল বোঝাতে আমরা কথায় কথায় একটা নাম ব্যবহার ক'রে থাকি—রাজা মান্ধাতার নাম। মান্ধাতার আমল কথাটা তোমরাও শুনেছ নিশ্চয়ই।

এই মান্ধাতা ছিলেন একজন অতি প্রাচীন অর্থাৎ সত্যযুগের পুণ্যবান্ রাজা, আর তাঁরই বংশধর ছিলেন মুচুকুন্দ, যাঁর কথা নিয়ে এই গল্প। সে-কালে স্বর্গের দেবতাদের সঙ্গে নাকি মানুষের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ছিল। তখনকার যাগযজ্ঞ-কাজকর্ম উপলক্ষে আহূত হয়ে দেবতারা মানুষের সমাজে আসতেন, পূজো নিতেন, বর দিতেন, কত অনুগ্রহ করতেন। মান্ধাতার মত মুচুকুন্দও ছিলেন এক মহা শৌর্য-বীর্যশালী প্রবল-প্রতাপ রাজা; তাঁর বলবীর্য ছিল অসাধারণ, পৃথিবীতে কেউই তাঁকে এঁটে উঠতে পারত না।

শুধু পৃথিবীর মানুষ নয়, স্বর্গের দেবতারাও তাঁকে মহাশক্তিমান্ ব'লে গণ্য করতেন। দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং তাঁকে বিশেষ খাতির করতেন, বন্ধু ব'লে সম্মান দিতেন, খুব ভালও বাসতেন। রাজা মুচুকুন্দ মধ্যে মধ্যে সোমযজ্ঞ ক'রে পুরন্দরকে (পুরন্দর হ'ল ইন্দ্রেরই

আর-এক নাম) আহ্বান করতেন, মহা উৎসব চলত রাজভবনে, আনন্দের স্রোত যেত বয়ে—সোমরস যে দেবরাজের বড়ই প্রিয় বস্তু! এই ভাবে তাঁদের ভালবাসা ক্রমে গভীর বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল। দেবতার অনুগ্রহে এই পৃথিবীতে মহারাজ মুচুকুন্দের এই আধিপত্যের মহাভাগ্য অন্যান্য রাজারা কিন্তু ঈর্ষার চোখে দেখতেন। মুচুকুন্দ অবশ্য তাঁদের গ্রাহ্যের মধ্যেই আনতেন না। যাই হোক্, এমনি সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে অনেক কাল তিনি কাটিয়ে দিলেন। শেষে এক সময়ে দেবরাজের এক বিষম বিপদ উপস্থিত হ'ল,—ভয়ঙ্কর একদল অসুর এসে তাঁর স্বর্গরাজ্যে হানা দিলে।

পুরন্দর ব্যতিব্যস্ত হয়ে দেব-সেনাপতি কার্তিকেয়ের হাতে যত দেবসৈন্য ছিল সব একত্র করলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। কিন্তু অসুরদের দল ছিল খুবই শক্তিশালী,—কিছুতেই তাদের পরাজিত করা সম্ভব হ'ল না। তখন দেবরাজ বিষম চিন্তায় পড়লেন। হঠাৎ বন্ধু রাজা মুচুকুন্দের প্রবল প্রতাপের কথা তাঁর স্মরণ হ'ল। তিনি রাজাকে ডেকে পাঠালেন, তাঁর পক্ষ নিয়ে অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। রাজা মুচুকুন্দ, অনেকদিন কোনো যুদ্ধবিগ্রহ না পেয়ে, অন্য বিষয়ে মন দিয়েছিলেন; এখন মনোমত একটি কাজ পেয়ে খুবই খুশী হয়ে পরমানন্দে স্বর্গে ইন্দ্রদেবের দরবারে হাজির হ'লেন। দেবরাজ ত' তাঁকে পেয়ে খুব খুশী; সঙ্গে সঙ্গেই এই যুদ্ধে তাঁকে দ্বিতীয় সেনাপতির পদে বরণ ক'রে নিলেন। যুদ্ধ এবার খুব জ'মে উঠল।

যুদ্ধটা বড় কম দিন ধ'রে চলে নি, পূরো বারোটি বছর ধ'রে চলেছিল। স্বর্গে যখন শান্তি ফিরে এল, অসুরের দল পরাভূত হয়ে যখন স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হ'ল,—তখন রাজা মুচুকুন্দের কাজও শেষ হ'ল। দেবরাজ বড়ই সন্তুষ্ট হয়ে রাজাকে আলিঙ্গন

ক'রে বর দিতে চাইলেন। তিনি বললেন, "বন্ধু, তুমি যে এই বারোটা বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করেছ, যার ফলে আমার এই স্বর্গরাজ্য নিরাপদ হয়েছে—তার পুরস্কার কি আর আমি দিতে পারি? তবে, তুমি মনোমত বর প্রার্থনা কর, যা' তোমার ইচ্ছে—তোমার মত বন্ধুকে অদেয় বর আমার কিছুই নেই। কিন্তু একটা কথা তুমি জেনে রাখ, এখন পৃথিবীতে ফিরে গিয়ে তুমি তোমার সমসাময়িক কাকেও আর সেখানে দেখতে পাবে না।"

কারণ যেটা, সেটা জেনে রাখা ভাল। স্বর্গের বারো বছর পৃথিবীর হিসেবে কতটা সময়, সেটা দেবরাজ বুঝিয়ে দিলেন। পৃথিবীর ৩৬৫ দিনে অর্থাৎ এক বছরে স্বর্গের একদিন, সেই হিসেবে পৃথিবীর তিনশো পঁয়ষট্টি বছরে স্বর্গের এক বছর। তা'হ'লেই, স্বর্গের বারো বছরে হ'ল পৃথিবীর প্রায় ৪৩৮০ বছর অর্থাৎ স্বর্গের এই বারো বছরে পৃথিবীর মধ্যে কত যুগই না চ'লে গেছে! কাজেই, পৃথিবীতে রাজা মুচুকুন্দের সময়ের আর কারো ত' বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

রাজা ভাবলেন,—তাইতো! কি বর নেওয়া যায়? ধন-ঐশ্বর্য-রাজ্য-সম্পদ্‌ভোগ যাদের নিয়ে, তারা কেউ ত' আর নেই। এখন একলা একলা গিয়ে পৃথিবীতে রাজ্য-ঐশ্বর্য ভোগ ক'রে কি লাভ? আর আমার সে রাজ্যই বা এখন কোথায়, কে জানে? তা' না হয় দেবরাজের বরে সে রকম রাজ্য-ঐশ্বর্য পাওয়া গেল, কিন্তু আমার সে রাজ্য-ঐশ্বর্যভোগ দেখবে কে? যাদের সঙ্গে থাকতে ভালবাসি, ঐশ্বর্যভোগ যাদের সঙ্গে নিয়ে করতে চাই, তারাই যখন কেউ নেই, তখন কি হবে আর ওসব রাজ্য-ঐশ্বর্যের আকাঙ্ক্ষায়? দূর কর ছাই, ওসব আমার আর কিছু চাই না।

—দুই—

আমরা ধন, মান বা রাজ্য-ঐশ্বর্য ভোগ চাই বটে—কিন্তু যাদের ভালবাসি তাদের নিয়েই এইসব চাই, একলা ভোগে ত' সুখ নেই। আবার যারা আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী তাদেরও আমাদের শৌর্যবীর্য দেখাতে চাই। তারা না হ'লে আমাদের কাজ দেখবে কারা? আর তারা না দেখলে ত' আমাদের শৌর্য-বীর্য সবই বৃথা। তা হ'লে এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, আমরা সমসাময়িক লোকের মধ্যেই থাকতে, কাজ করতে, বা যত কিছু ভোগ করতে চাই। অন্য দেশে, অন্য লোকসমাজে আমরা ঠিক যেন আনন্দ পাই না। কাজেই রাজা মুচুকুন্দ ঠিক করলেন যে, আর ওসব ভোগ-ঐশ্বর্যের মধ্যে তিনি যাবেন না।

তিনি দেবরাজের কাছে এই বর চাইলেন, "দেবরাজ, এই দীর্ঘ বারোটা বছর নিরন্তর যুদ্ধশ্রমে এখন আমি ক্লান্তবোধ করছি। এখন একটু বিশ্রাম করতে চাই, একটু ঘুমোতে চাই। নিশ্চিন্ত হয়ে আমি একটু দীর্ঘ নিদ্রা দিতে চাই। এই বর আমায় দিন যেন আমার এই নিদ্রায় কোনো ব্যাঘাত না ঘটে। যে আমার ঘুম ভাঙ্গাবে সে যেন তৎক্ষণাৎ ভস্ম হয়ে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে যেন আমারও ভগবৎ-সান্নিধ্যলাভ হয়, অর্থাৎ সে-ঘুম ভাঙবার পর আর যেন আমাকে মরলোকে থাকতে না হয়, আমি যেন পরম পুরুষের সঙ্গলাভ করতে পারি।"

ইন্দ্র মহাখুশী হয়ে বললেন, "তথাস্তু।"

তখন রাজা পৃথিবীতে এলেন মনোমত স্থান ঠিক করতে, যেখানে তিনি নির্বিবাদে ঘুমোতে পারবেন—স্বর্গে ত' আর ঘুমোবার ব্যবস্থা

নেই। আমাদের এই ভারতই ছিল পৃথিবীর মধ্যে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় স্থান; তাই ঘুমোবার জন্যেও তিনি এলেন এই ভারতেই। উত্তরাখণ্ডে এক বিজন পর্বতগুহা বেছে নিলেন তিনি। সে এমন এক স্থান—যেখানে কারো, এমন কি কোনো জন্তু-জানোয়ারেরও, যাবার সম্ভাবনা নেই। স্থানটি নির্বাচন ক'রে তিনি সেখানে পদ্মনাভ ভগবানকে স্মরণ ক'রে শুয়ে পড়লেন, আর অচিরেই গাঢ় সুষুপ্তিতে মগ্ন হয়ে গেলেন। যুগ-যুগান্তর ধ'রে তিনি শান্তির কোলে ঘুমোতে লাগলেন।

—তিন—

কৃষ্ণকে অনেকেই বলেন ভগবানের অবতার। অবতার মানে মানুষের সমাজে নিজ ইচ্ছামত অবতীর্ণ ভগবানের মানুষী রূপ। এই ভারতের লোক এমনই ভগবানের ভক্ত যে, যখনই তারা কারো কাজ অসাধারণ অর্থাৎ মানুষের সাধারণ শক্তির, সাধারণ বুদ্ধির অতীত দেখতে পায় তখনই তাদের সেই ভগবানকেই মনে পড়ে যায়। ভগবান না হ'লে এ-সব কাজ কি মানুষের দ্বারা সম্ভব? কাজেই, এমনই অসাধারণ অমানুষী শক্তির কাজ যে ব্যক্তি করতে পারেন তিনি সেই ভগবানের অবতার ছাড়া আর কেউ হতে পারেন কি? —এমনই এখানকার লোকদের বিশ্বাস।

তখনকার দিনে বেদব্যাস ছিলেন একজন অসাধারণ লোক, তিনি কৃষ্ণকে শুধু ভগবানের অবতারই বলেন নি, বলেছেন—কৃষ্ণই পূর্ণ অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্। অতবড় একজন ঋষি, তিনি ত' আর ভুল বা মিথ্যা বলেন নি! আমরা অনেকেই তাঁর কথা

পূর্ণ সত্য ব'লেই জানি এবং মনে প্রাণে মানি। তাই শ্রীকৃষ্ণের কথা, তাঁর লীলা, তাঁর চরিত্র-আলোচনায় আনন্দ পাই—এত ভালবাসি আমরা তাঁকে।

এই কৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েছিলেন দ্বাপর যুগের শেষের দিকে। ক্রমে ক্রমে তিনি তাঁর আসল কাজ আরম্ভ ক'রে দিলেন। তাঁর এই কাজ ছিল বড় চমৎকার। জগতের লোককে সুখ শান্তি ও আনন্দ দেওয়াই ছিল তাঁর কাজ। সেই আনন্দের হন্তা যে, সে লোক-সমাজের শত্রু সুতরাং কৃষ্ণেরও শত্রু। আর তাই প্রজাপীড়ক রাজামাত্রই ছিল তাঁর শত্রু। তারা সকলেই প্রায় কোন-না-কোন উপায়ে ধ্বংসের পথেই গিয়েছে, অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে কৃষ্ণই ছিলেন তাদের ধ্বংসের মূলে। কারণ, তাঁর কাজই হ'ল প্রজাপীড়ক অধার্মিক অত্যাচারী লোকেদের মনুষ্য-সমাজ থেকে সরিয়ে দেওয়া। তবে তাঁর শত্রু যারা, তারাও সবাই ছিল বড় ভয়ানক প্রকৃতির—প্রত্যেকেই এক একটা দিক্‌পাল বিশেষ। নানা রকমে তারা অত্যাচার করত তাদের প্রজাপুঞ্জের ওপর। শ্রীকৃষ্ণের ওপর তাদের আক্রোশের প্রধান কারণ—দেশের সবাই তাঁকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, সবাই তাঁকে শ্রেষ্ঠ বলে, সকলেরই তিনি বন্ধু। সবার ওপর, লোকে তাঁকে ভগবান মনে করে, অথচ কৃষ্ণ ত' তাদের মতই একজন মানুষ—শ্রীকৃষ্ণের এই শ্রেষ্ঠত্ব তারা কোনমতেই সহ্য করতে পারত না। কাজেই নানারকমের শত্রু ছিল তাঁর ; তবে ঐ সমস্ত শত্রুদের কেমন ক'রে ধ্বংস বা নিপাত করতে হয় তার কৌশলও তাঁর অজানা ছিল না। নানারকমের ঐ সব দুষ্টদের অনেককেই তিনি নানাভাবেই ধ্বংসও করেছেন। তাঁর এই সব দুষ্ট শত্রুদের মধ্যে যে ছিল প্রবলতম তার নাম—কালাযবন।

এখন, এই কালাযবন কে ছিল তাই তোমাদের বলছি। আমরা এখন যাদের গ্রীক বলি, তাঁদের পূর্ব-পুরুষদের সঙ্গে এই ভারতের এককালে ছিল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কারণ তাঁরাও ছিলেন আর্য আর ভারতের আর্য হিন্দুদের দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এখানে এসে স্থায়িভাবে বসবাসও করেছিলেন ; রাজত্বও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ভারতকে তাঁরা আপন ক'রে নিয়ে বেশ আনন্দেই বংশের পর বংশ বৃদ্ধি ক'রে চলেছিলেন। এই কালাযবন ছিল তাঁদেরই বংশের একজন ঘোর অত্যাচারী, ভীষণ-প্রকৃতি রাজপুত্র।

কালাযবন ছিল যুবক, দেখতে সুন্দর, গঠন খুব বলিষ্ঠ। সেকালে সাধারণতঃ সকলেরই শরীর ছিল বলিষ্ঠ, যেমন এখন গ্রীস দেশের ভাস্কর্য কলায় দেখা যায়। তখনকার ভারতেও কদাচিৎ দুর্বল লোক দেখা যেত। বিশেষতঃ, রাজপুত্রেরা ত' প্রত্যেকেই ঘরে মল্লবীর রেখে ব্যায়াম-চর্চা করতেন, প্রত্যেক রাজপুত্রই তখনকার দিনে মস্ত বড় মল্লবীর বা পালোয়ান হতেন। দুর্যোধন, ভীম, কৃষ্ণ, বলরাম, শিশুপাল, জরাসন্ধ এঁরা সকলেই বিখ্যাত মল্লবীর ছিলেন। কালাযবনও ছিল সেই রকম একজন মল্লবীর। তবে সে কানে একটু খাটো ছিল ব'লেই 'কালা' এই উপাধি তার হয়েছিল।

এখন, কৃষ্ণের ওপর এই লোকটির একটা বিজাতীয় ঘৃণা আর বিদ্বেষ ছিল। কৃষ্ণের বীরত্বের কথা সে একেবারেই শুনতে পারত না। মনে মনে খুব একটা রাগ তার বরাবরই ছিল—একবার বাগে পেলে হয়!

কৃষ্ণ কিন্তু সব সময় যে নিজের হাতে বা গায়ের জোরে বা স্বয়ং যুদ্ধে নেমে নিজের শক্তিতে তাঁর শত্রুদের মারতেন তা নয়, আগেই বলেছি অনেক সময় তিনি কৌশলেই কাজ শেষ করতেন।

এই ভাবে অনেকদিন রাগ পোষণ ক'রে রাখবার পর একদিন কালাযবন কৃষ্ণকে একলা পেয়ে, এইটেই সুবর্ণ-সুযোগ বু'ঝে, তাঁকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান ক'রে বসল। কৃষ্ণ ক্ষত্রিয় বীর, তৎক্ষণাৎ সেই ডাকে সাড়া দিলেন। ঘটনাটা ঘটল একটা পাহাড়ের নীচে, পথের ধারে। কৃষ্ণ রথে ক'রে সেই পথ দিয়ে একলাই যাচ্ছিলেন। কালাযবনের ডাকে, দ্বন্দ্ব যুদ্ধের কথায়, রথ থেকে তিনি নেমে পড়লেন। এখন, এই দ্বন্দ্ব যুদ্ধের কয়েকটি বিশেষ নিয়ম আছে। তার মধ্যে একটি হ'ল এই যে, যাকে যুদ্ধে আহ্বান করা হয় সুবিধে মত যুদ্ধের স্থান নির্বাচনের অধিকার তারই থাকে।

—চার—

কৃষ্ণের মনে কি ছিল তা তিনিই জানেন। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা গেল যে, তিনি রথ থেকে নেমে সামনের পাহাড়ের দিকেই চলতে লাগলেন—যে পাহাড়ের গুহায় মহারাজ মুচুকুন্দ ঘুমিয়ে রয়েছেন বহুকাল ধ'রে। কালাযবন ভাবল,—হয়ত মনোমত স্থান নির্বাচনের জন্যেই কৃষ্ণ ঐ দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন! ঐ পাহাড়ের স্কন্ধদেশে তাঁর সুবিধে মত জায়গা পেলেই বোধ হয় যুদ্ধ হবে!—এই ভেবে সেও পেছনে পেছনে চলতে লাগল। কৃষ্ণ এমন ভাবে এগিয়ে চলতে লাগলেন যেন তিনি নিকটেই কোথাও যুদ্ধ আরম্ভ করবেন। অবশ্য দেখে মনে হচ্ছিল না যে, তিনি দ্রুত চলছেন। কিন্তু তিনি যে-ভাবে চলছিলেন তাতে কালাযবন বেশ জোরে চ'লেও তাঁকে ধরতে পারছিল না। দু'জনের দূরত্ব ঠিক সমান ভাবেই রয়ে গেল। কালাযবন যখন দেখলে যে, কৃষ্ণের কাছে গিয়ে তাঁকে ধরতে

হ'লে দৌড়োনো ছাড়া উপায় নেই, তখন সে দৌড়ুতে লাগল। কিন্তু কৃষ্ণ যে রকম স্বাভাবিক ভাবে এগিয়ে চলেছেন তাতে তাঁকে ধরার জন্যে এমনি ভাবে দৌড়োনো তার মত একজন বীরের পক্ষে লজ্জার কথা—এই ভেবে কালাযবন দৌড়োনো থামিয়ে যতটা পারে দ্রুত চলতে লাগল। কিন্তু, তাতেও ছ'জনের মধ্যে ব্যবধান যেমন ছিল ঠিক সেই রকমই রয়ে গেল।

ক্রমে তাঁরা সেই পাহাড়ের খুব কাছাকাছি এসে পড়লেন। অল্পক্ষণ পরেই কৃষ্ণকে আর দেখা গেল না। পাহাড়ের অন্তরালে কৃষ্ণ অদৃশ্য হয়ে গেলেন দেখে কালাযবন আরও দ্রুতপদে—প্রায় দৌড়েই—চলল তাঁকে ধরতে। আর তার মুখ থেকে অবিরাম কৃষ্ণের সম্বন্ধে অজস্র গালি বর্ষিত হ'তে লাগল।

পর্বতের এ-দিক ও-দিক ঘুরে কালাযবন কৃষ্ণকে খুঁজে খুঁজে বেড়াতে লাগল কিন্তু কোথাও তাঁর কোনো চিহ্নই পাচ্ছিল না। যতই বিফল হচ্ছিল তার খোঁজা, ততই সে ভেতরে ভেতরে আগুন হয়ে উঠছিল, আর গালাগালের মাত্রাও তার বেড়ে চলেছিল। এই ভাবে রাগে অন্ধ হয়ে কালাযবন ঢুকল এক প্রকাণ্ড গুহায়। যদি এর মধ্যে কৃষ্ণ কোথাও লুকিয়ে থাকেন—এই ভেবে গুহার মধ্যে সে চারিদিকে খুঁজতে লাগল। প্রথম গুহাটা একটু আলো—তারপর যে গুহা সেটা অনেকটাই অন্ধকার। রাগে ফুলতে ফুলতে মনে মনে সে ভাবছে—একবার পেলে হয়, এক ঘুঁষিতে একেবারে তাকে যমালয়ে পাঠাব। কিন্তু সে গুহায়ও তাঁকে পাওয়া গেল না। তার পর আরও একটা বিরাট গুহা—তার ভেতরে ঘোর অন্ধকার। তার মধ্যে ঢুকে কতকটা এগিয়ে গিয়ে রাজা মুচুকুন্দের দেহে ঠোক্কর লেগে হুম্‌ড়ি খেয়ে কালাযবন পড়ল ঘুমন্ত রাজার গায়ের ওপর।

এইবার পেয়েছি! তবে রে দুষ্ট, কপট—এখানে এসে শুয়ে শুয়ে ঘুমের ভাণ হচ্ছে?—ব'লে, কৃষ্ণ মনে ক'রে, সে ঘুমন্ত মুচুকুন্দকে এমন ঘন ঘন পদাঘাত করতে লাগল যে তিনি আর ঘুমিয়ে থাকতে পারলেন না। জেগে উঠে তিনি দেখলেন—একটা মানুষ তাঁকে পদাঘাত করছে।—কে এ? কেনই বা আমায় ঘুমের মাঝে এভাবে পাগলের মত অপমান আর বিরক্ত করছে?—কালাযবনের দিকে রুষ্ট হয়ে চেয়ে দেখলেন মুচুকুন্দ। দেখবামাত্রই ছাই হয়ে কালাযবন ঝুর্ ঝুর্ ক'রে ঝ'রে পড়ল। কালাযবনের বিশাল বলিষ্ঠ দেহের জায়গায় সেখানে পড়ে রইল একরাশ ছাই।

রাজা মুচুকুন্দ তখন ভাবতে লাগলেন,—কে এ? এখানে আমার ঘুম ভাঙিয়ে কেন মরতে এল? এত জায়গা থাকতে এখানেই বা এল কেন?—এইসব ভাবছেন আর চারদিক দেখছেন।

হঠাৎ তিনি দেখলেন, অল্প দূরে একটি সুন্দর, সুপুরুষ, বিশাল-শরীর, বীরের পোষাক পরা এক মূর্তি তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছেন। গুহার মধ্যে গাঢ় অন্ধকার, কিন্তু তা'হ'লেও এই নবাগত মূর্তিটি তিনি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন। তাঁর রূপ আর দেহের কান্তি এমনই উজ্জ্বল যে তাতে এই অন্ধকারেও তাঁকে খুব স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল। তাঁর শরীরের সুগঠন, তাঁর বেশভূষা, কানের কুণ্ডল, তাঁর বিশাল চক্ষুদুটির তারা পর্যন্ত যেন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। মুচুকুন্দ আশ্চর্য হয়ে গেলেন—এই যে একটু আগে একটি মানুষ এসে এখানে তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে মৃত্যু বরণ করলে—এর রহস্য বোধ হয় ইনি জানতে পারেন। এই ভেবে জিজ্ঞাসা করলেন,—ওগো ভদ্র, ওগো অপরূপ. তুমি কে? তোমার নাম কি?

অসংখ্য আমার নাম—একটু মুচকে হেসে কৃষ্ণ বললেন—

নাম ত' আমার একটি দু'টি নয় - অনেক ; কি বলব, কোনটাই বা বলব ! তবে, যে আমায় যা ব'লে ডেকে সুখী হয়, তাই আমার নাম।

মুচুকুন্দ রাজা ভাবলেন—তাইত' ! সাধারণের ত' একটা দু'টো নামই হয় ! অসংখ্য নাম ত' একমাত্র ভগবানেরই হয় ! তবে ইনি কে ? ইনিই কি ভগবান্—আমাকে কৃপা করতে এলেন ?

তিনি তখন আবার জিজ্ঞাসা করলেন,—তোমার নিবাস কোথায় ? কোন্ দেশের লোক তুমি ?

কৃষ্ণ আবার হেসে উত্তর দিলেন,—আমার দেশও ত' সর্বত্র, মানুষের গম্য অগম্য সকল স্থানই ত' আমার দেশ। এমন স্থান ত' দেখি না যা আমার অধিকারে নয়।

শুনে মুচুকুন্দ রাজার প্রাণের মধ্যে মহা-আনন্দের তরঙ্গ উঠতে লাগল। তিনি মনে মনে ভাবলেন,—তাঁকেই তো চাইছি আমি—যাঁর অনেক নাম, নামের সীমা-সংখ্যা নেই,—যিনি সকল স্থানেই আছেন, —যিনি অনন্ত,—এই ত' তিনি যাঁর দর্শনে জীবন সার্থক হয় ! তবে আমার আশা ত' পূর্ণ হয়েছে।—তিনি তখন—এই যে লোকটি এখনই তাঁর রোষে ভস্ম হয়ে গেল সে কে, কেনই বা তার এরকম হ'ল—এই সমস্ত জানতে চাইলেন। কৃষ্ণ তখন তাঁকে সবই খুলে বললেন— এই কালাযবন বড়ই অত্যাচারী, ভগবৎ-বিদ্বেষী ; তার কাল পূর্ণ হয়েছে ব'লেই ঘটনাচক্রে আমায় হত্যা করবার জন্যই সে এখানে এসে পড়েছিল। আমি ত' আর কিছু জানি না—এসে দেখছি যে সে লোকান্তরে গিয়েছে, আর তুমি এখানে আছ। বেশ, বল ত' আমায়, এখন কি করতে হবে ? তুমি কি চাও ?

এইখানে এই আসনে ব'সেই আমি নিত্যধামে যেতে চাই—তুমি একবার আমার সামনে এসে দাঁড়াও।—ব'লেই রাজা স্থির হয়ে বসলেন তাঁর আসনে, কৃষ্ণ এসে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন। ধ্যানের বস্তু প্রত্যক্ষ করতে করতে রাজা দেহত্যাগ ক'রে অমরলোকে চলে গেলেন। দেবরাজের দেওয়া বর সার্থক হ'ল।
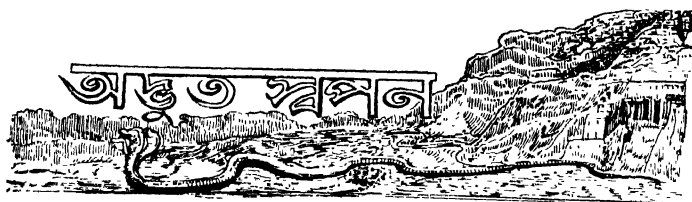
—এক—

এমন একটা সময় আমাদের দেশে ছিল, যখন শুধু সাধারণ গৃহস্থ নয়, বড় বড় লোক—এমন কি, স্বাধীন রাজা মহারাজা পর্যন্ত—প্রত্যেক কাজেই জ্যোতিষ-শাস্ত্রের মত মেনে চলতেন। যখনই তাঁদের কোনো উৎসব-আনন্দের আয়োজন করতে হ'ত, অথবা যখন কোনো দূর-দূরান্তরে যাত্রা, সৈন্য-চালনা অথবা যুদ্ধ-বিগ্রহ করতে হ'ত—এমন কি, মৃগয়ায় যেতে হ'ত—তাঁরা আচার্যের উপদেশ না নিয়ে বার হ'তেন না। যত প্রকারের ধর্ম ও কর্ম অনুষ্ঠান হিন্দুদের হ'তে পারে, সে সকলের সঙ্গে জ্যোতিষ-শাস্ত্রের ঘনিষ্ঠ যোগ ত' ছিলই—উপরন্তু কোনও একটি বিশিষ্ট স্বপ্নের ব্যাপারেও আচার্য ডেকে ফলাফলের মীমাংসা না হ'লে শান্তি ছিল না। এমনই একটি স্বপ্নের কাহিনী এখানে বলছি, যাতে স্বপ্ন সম্বন্ধে সেকালের লোকের মনোভাবও যেমন বোঝা যাবে, তেমনই স্বপ্ন-রহস্য যে কতটা গভীর হ'তে পারে তারও পরিচয় পাওয়া যাবে।

এটি বুদ্ধদেবের সময়ের কথা। বুদ্ধদেব তখন বিদিশার এক আম্রকাননের মধ্যে বাস করছিলেন। অনেক অনেক ভক্ত থাকতেন

তাঁর সঙ্গে—সৎধর্ম-প্রসঙ্গের আলোচনা চলত ; তাঁর উপদেশে বইত অমৃতের ধারা। আশ-পাশের চারিদিকে বেশ একটা সাড়া পড়ে গেছে। অনেক দূর থেকে অনেক গৃহী লোক আসে তাঁর দর্শন পেতে। তার ওপর আবার যখন সকলে জানতে পেরেছে যে তাঁর ধর্মে জাতিবিচার নেই, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রের পার্থক্য নেই, ছোট-বড় সকল জাতিই তাঁর কাছে আপনার—তখন সকলেই তাঁর কাছে ছুটে যাচ্ছে। বিদিশার রাজা কিন্তু মোটেই বুদ্ধদেবের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মেরই পক্ষপাতী, কাজেই সেই দলের লোক তিনি। তবে তিনি তাঁকে (বুদ্ধকে) উত্ত্যক্তও করেন নি, বা প্রকাশ্যে তাঁর প্রতি বিদ্বেষও প্রকাশ করেন নি। তাঁর উদারতা ছিল অসীম, বিশেষতঃ ধর্ম সম্বন্ধে।

এই বিদিশার রাজা কিন্তু একদিক দিয়ে বড়ই উদ্ধত প্রকৃতির লোক ছিলেন। কারও অহংকার বা স্পর্দ্ধা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। মহা শৌর্য-বীর্যশালী লোক তিনি। নামটি তাঁর শত্রুজিৎ। বয়স তাঁর পঞ্চাশ, কিন্তু এমনই তাঁর শরীরের বাঁধন যে তাঁকে দেখলে তাঁর বয়স আরও দশ বারো বছর কম ব'লেই মনে হ'ত। তাঁর গুণও ছিল অসাধারণ ; যারা তাঁর কাছে আসত, তাদের মুখ দেখেই ঠিক বুঝতে পারতেন—কি প্রকৃতির লোক তারা। শাস্ত্র-চর্চা, কাব্য-চর্চা খুব জোর

চলত তাঁর সভায়, যেমন চলত সঙ্গীত ও নৃত্যকলার অনুশীলন। দয়া-দাক্ষিণ্যও তাঁর বড় কম ছিল না, কোনও প্রার্থী কখনও তাঁর কাছ থেকে বিমুখ হয়ে ফিরেছে ব'লে শোনা যায় নি। তা' ছাড়া, সেকালের নানা অস্ত্র-শস্ত্রের প্রয়োগেও তিনি ছিলেন সুনিপুণ, এবং মৃগয়া থেকে সুরু ক'রে যত খেলা রাজাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল সব কিছুতেই ছিল তাঁর এমনই দখল যে, সাধারণের মধ্যে তাই নিয়ে মহা উৎসাহের সঙ্গে আলোচনা চলত নিত্যই। মোট কথা, যতপ্রকার যুদ্ধ-কৌশল তখনকার দিনে বীরসমাজে প্রচলিত ছিল, খেলার মতই সে-সব তাঁর আয়ত্ত ছিল।

তবে, মন্ত্রণার ধার তিনি কখনও ধারতেন না, যদিও তাঁর প্রধান মন্ত্রী ছিলেন অতি বিচক্ষণ, এবং একটি সুগঠিত মন্ত্রিমণ্ডলও তাঁর ছিল। নিজে যা ভাল বুঝতেন, তাই তিনি করতেন। কাউকে তাঁর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে দিতেন না। তাঁর বিচাব-প্রণালী ছিল অতি সূক্ষ্ম ; তিনি কখনও অন্যায় বিচার করতেন না, আর তাঁর রাজ্যে কোনো রকমের অন্যায় বিচার হ'তেও দিতেন না। এমনই একজন বহুগুণসম্পন্ন রাজা ছিলেন তিনি,—সব রকম রসের সংস্কৃতি ছিল তাঁর মধ্যে, সকলের সঙ্গে প্রাণ খুলে তিনি কথা বলতেন, সময় বিশেষে রহস্য পরিহাসেও তিনি শ্রেষ্ঠ রসিকতার পরিচয় দিতেন। তাঁকে কেউ কখনো বিমর্ষ দেখে নি।

এমন যে বিদিশার নরপতি—নৃপমণি ব'লেই যাঁকে লোকে জানত—একদিন তাঁকেও বড়ই চিন্তিত দেখা গেল। মুখে তাঁর মহা উদ্বেগের ছায়া। ঘুম থেকে তিনি উঠতেন ব্রাহ্ম মুহূর্তে ;—সেদিনও তাই উঠলেন, তবে সেদিন মুখটি তাঁর ভার-ভার, বড়ই গম্ভীর, কারও সঙ্গে কথাই কইছেন না। যে সময়ে তাঁর সভায়

আসবার কথা, সে সময়েও তিনি নিজের বসবার ঘরেই রইলেন, মন্ত্রীকে ব'লে পাঠালেন—আজকের মত সভা বন্ধ থাকবে। তারপর, গ্রহাচার্যকে সত্বর উপস্থিত হবার জন্য রাজাদেশ জানিয়ে একজন অনুচরকে পাঠান হ'ল, আর প্রহরীদের ওপর হুকুম হ'ল—তাঁকে কেউ যেন বিরক্ত করতে না আসে,—বিশেষ আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত রাজদর্শন বন্ধ রইল।

যথাসময়েই গ্রহাচার্য এলেন রাজপুরীতে। দ্রুতগতি তাঁকে রাজসকাশে পৌঁছে দেওয়া হ'ল। আসন থেকে উঠে মহারাজ তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। আসন-গ্রহণের পর আচার্য মহারাজের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন।

মহারাজ বললেন,—আচার্যদেব, আমার অন্য কোনও অ-কুশল নেই, কেবল একটি স্বপ্নের ব্যাপার আমায় বড়ই চিন্তিত ক'রে তুলেছে; ঠিক বুঝতে পারছি না স্বপ্নটি শুভ কি অশুভ—তাই আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।

আচার্য স্বপ্নের নাম শুনেই খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন। তিনি জানতেন, তাঁর যত কিছু কাজ আছে তার মধ্যে স্বপ্নতত্ত্ব নির্ধারণই সর্বাপেক্ষা জটিল। তাই স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শোনবার আগে বিশেষ চিন্তিত মনেই তিনি কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় কথা জিজ্ঞাসা করলেন মহারাজকে; যেমন,—মহারাজ কোন্ সময়ে, অর্থাৎ রাত্রের কোন্ প্রহরে, স্বপ্নটি দেখেছেন; তারপর আর ঘুমিয়েছিলেন কি না; সে সময় মহারাজের কাপড় আঁট ছিল, না, আল্‌গা ছিল; তিনি তখন ঘরের মধ্যে শুয়েছিলেন, না, মুক্তস্থানে শুয়েছিলেন; সে-সময় তাঁর সঙ্গে কোনো রানী ছিলেন কি না; কাল সকাল থেকে শোবার সময় অবধি কি কি কাজ তিনি করেছিলেন; কাল

মহারাজের মানসিক অবস্থা কিরূপ ছিল; ইত্যাদি। এই রকম অনেকগুলি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়ে মহারাজ বললেন,—আচার্যদেব, প্রশ্নের স্রোতে যে আমায় ভাসিয়ে দিলেন সমুদ্রে—পারে ওঠাবার ব্যবস্থা আছে ত' ?

আচার্য একটু হেসে বললেন—আমার আর একটি কথা জানার আছে, সেটি না জানলে আমার পক্ষে আপনার স্বপ্নের মীমাংসা করা
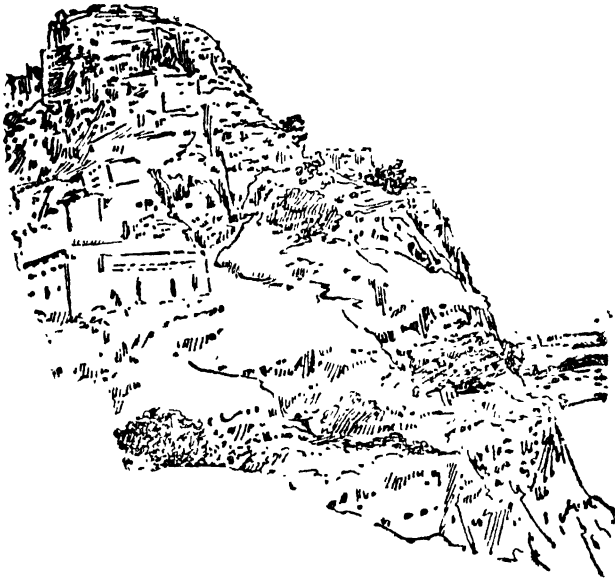
কঠিন হবে। সেটি এই—আপনার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ আছে ত', না, কোন ব্যাধি আছে ?

রাজা বললেন—এই স্বপ্ন দেখার পূর্বে কাল রাত্রি পর্যন্ত শরীর আমার সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল; তবে, আজ স্বপ্ন দেখার পর থেকে, আমার

মনের মধ্যে একটা উদ্বেগ চলেছে ; এতটা অবসন্ন হয়ে পড়েছি যে, এখন মনে হচ্ছে যেন শরীরটাও ভাল নেই।

শুনে আচার্য বললেন—আচ্ছা, মহারাজ, এখন বলুন আপনার স্বপ্নবৃত্তান্ত। ঠিক পর পর কি কি দেখেছেন ?

রাজা বলতে লাগলেন, আর আচার্য ভূর্জপত্রে সেগুলি ঠিক ঠিক লিখতে লাগলেন।

সংক্ষেপে রাজার স্বপ্নবৃত্তান্ত হ'ল এইরকম—

প্রথমে দেখলাম, আমি যেন একটি বিশাল দুর্গের অত্যুচ্চ শিখরে দাঁড়িয়ে রয়েছি। তারপর দেখলাম, একটি অপরূপ লাবণ্যময়ী দেবী-প্রতিমা, হাতে তাঁর সাতটি শ্বেত পদ্ম। আমি যেন কি একটা কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে গেলাম, কিন্তু তখনই তিনি অদৃশ্য হ'লেন, আর তাঁকে দেখতে পেলাম না। তারপর দেখলাম—এক ভীষণ-মূর্তি ব্যাধ, হাতে তার ধনুর্বাণ। আরও দেখলাম, সে একটা তীর আমারই দিকে লক্ষ্য করছে ; তারপর সেই তীর সে নিক্ষেপও করলে, কিন্তু সেটা আমার গায়ে লাগল না ; কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল, একটা শোঁ শোঁ শব্দ মাত্র আমি শুনলাম। তারপর দেখলাম, কৃষ্ণবর্ণ তিন-ফণাযুক্ত একটা প্রকাণ্ড ভয়ঙ্কর সাপ আমারই দিকে এগিয়ে আসছে। দেখতে দেখতে সেটা আমার সামনে দিয়ে চলে গেল। আতঙ্কে আমার সর্বশরীর কেঁপে উঠল। আমি অত্যন্ত

কাতর হয়ে অসহায়ের মতো চাইতেই দেখলাম, কোথায় সেই সাপ! যেন ইন্দ্রজাল বলেই সে অদৃশ্য হয়ে গেছে আর তার জায়গায় এক অপরূপ সৌম্যমূর্তি, জ্যোতির্ময়-শরীর ভিক্ষু, ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে, আমার দিকে করুণা-ভরা চোখে চেয়ে আছেন। অগ্রসর হয়ে তাঁকে যেন কিছু বলতে গেলাম, অমনি ঘুম ভেঙ্গে গেল।

এই আমার স্বপ্নবৃত্তান্ত। ঘুম ভাঙ্গলেই স্পষ্ট অনুভব করলাম আমার ডান হাতের ওপরের পেশীগুলো কাঁপছে। আর আমি ঘুমোতে পারলাম না। আচার্যদেব, এখন আমার এই অদ্ভুত স্বপ্নের মীমাংসা ক'রে আমার উদ্বেগ দূর করুন।

—দুই—

আচার্য মহাচিন্তিত ভাবে বললেন—রাজন্! আমি এই অপূর্ব স্বপ্নকথা লিখে নিলাম; এর যথোপযুক্ত মীমাংসা করতে আমায় একটু সময় দিতে হবে। আপনি এখন নিশ্চিন্ত হয়ে রাজকার্যে মনোনিবেশ করুন। একটি কথা কেবল বিশেষ ভাবেই মনে রাখবেন,—যেটি ঘটবার সেটি অবশ্যই ঘটবে, তার জন্যে মনের মধ্যে কোনও অশান্তি রাখবেন না। জেনে রাখবেন মহারাজ, আমি আর অন্য কোনও কাজ না ক'রে এই কর্মেই আমার দেহ মন সম্পূর্ণ নিয়োগ করব। আর, যত শীঘ্র সম্ভব আপনার গোচরে এর ফলাফল জানিয়ে নিশ্চিন্ত হ'ব।

এর পর মহারাজ আর কি বলবেন? নিরুপায় হয়েই তিনি রাজী হলেন—তারপর আচার্যকে বিদায় দিয়ে যথাশক্তি নিজের

কাজে মনোনিবেশ করলেন, মনটা তাঁর অনেকটা হাল্‌কা হয়ে গেল। একটা যেন আশ্বাস পেলেন।

একদিন, দু'দিন, তিনদিন গেল—আচার্য মনে মনে বড়ই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। যতবারই তিনি গণনা করেন, ততবারই নানারকম অদ্ভুত অদ্ভুত উত্তর পেতে থাকেন। কিছুতেই তিনি এ স্বপ্নের ঠিক মীমাংসা করতে পারছেন না। কেবল শেষের দিকে যে অপরূপ ভিক্ষু বা শ্রমণের মূর্তি রাজা দেখেছেন সেটি যে ভগবান বুদ্ধেরই মূর্তি, কেবলমাত্র সেইটিই ঠিক ধারণা করতে পারলেন, এ বিষয়ে তাঁর কোনই সংশয় রইল না। মহা চিন্তিত হয়ে কত কি ভাবতে লাগলেন তিনি। তাঁর এই অক্ষমতার পরিণাম যে কি হবে, তাই ভেবে তিনি অন্তরে অন্তরে বিলক্ষণ শঙ্কিত হয়ে উঠলেন।

তখনকার দিনে ব্রাহ্মণেরা যে ভগবান বুদ্ধের ওপর খড়্গহস্ত ছিলেন, তা আগেই বলেছি। তাঁরা তাঁকে নির্বোধ, পাগল, অধার্মিক, নাস্তিক, বৈদিক ধর্মের মহাশত্রু ব'লে মনে করতেন। কারণ, বুদ্ধদেব প্রচার করেছিলেন যে, যাগ-যজ্ঞাদি বৈদিক কর্মের অনুষ্ঠানে মানুষের মুক্তি ত' দূরের কথা, মানুষ আরও অ-ধর্মে জড়িয়ে পড়ে। তাঁর মতে—পশুহত্যা মহাপাপ, অহিংসাই পরমধর্ম। একমাত্র অহিংসার বলেই মানুষের মন ও চরিত্র শুদ্ধ হয়, তাতেই মানুষ মুক্ত হ'তে পারে। প্রত্যেক

মানুষের জীবনে তার নিজের কর্মই বলবান্, দেবতা সেখানে অক্ষম। কোন দেবতার সাধ্য নেই যে, মানুষের অপকর্মের হাত থেকে তাকে মুক্ত ক'রে দিতে পারে। বিষয়ভোগের তৃষ্ণা বা প্রবৃত্তির ফলেই জীব সংসারে বদ্ধ হয়ে পড়ে। নিবৃত্তির পথে না গেলে ভোগ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে না, মুক্তিও নেই।
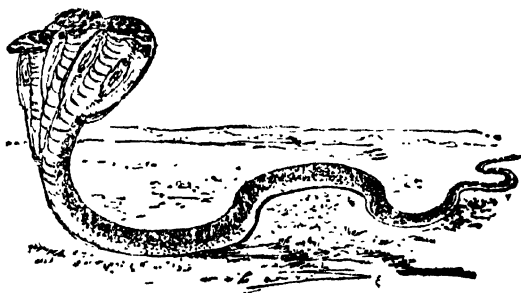
এই অশ্রুতপূর্ব সত্য প্রচারের ফলে, ব্রাহ্মণ সমাজ আর তাঁদের রক্ষক ক্ষত্রিয় রাজারা বুদ্ধদেবকে বৈদিকধর্মের মহাশত্রু ব'লেই মনে করতেন। বিদিশারাজের এই যে গ্রহাচার্য ব্রাহ্মণ, ইনিও যে বুদ্ধের শত্রুদের মধ্যেই একজন সে কথা বলাই বাহুল্য। শত্রুতা থাকলেও কিন্তু আচার্য মনে মনে ঠিক বুঝতে পারলেন যে, বুদ্ধ ব্যতীত এ স্বপ্ন-রহস্যের মীমাংসা আর কেউ করতে পারবেন না, কারও পক্ষেই তা' সম্ভবও নয়; অথচ মহারাজ ত' বুদ্ধের প্রতি প্রসন্ন নন,—কি করা যায় এখন!

এখানে একটা কথা জেনে রাখা ভাল যে, দিন দিন লোকের মনে বুদ্ধের ওপর ভক্তিশ্রদ্ধা বাড়ছিল। আর, যতই এই মহাপুরুষের অসামান্য যুক্তিতর্ক ও জ্ঞানরাজ্যের নানা গূহ্য ও সত্য তত্ত্ব প্রকাশের

ফলে লোক-সমাজ বুদ্ধদেবের দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ছিল, ব্রাহ্মণ-সমাজও ততই মনে মনে দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন ; কারণ, তাঁরা বুঝতে পারছিলেন তাঁদের যুক্তির শক্তি ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে আসছে।

এখন, আমাদের বুদ্ধিমান আচার্য কিংকর্তব্য চিন্তা ক'রে শেষে মহারাজের কাছে উপস্থিত হ'লেন আর তাঁকে সকল কথাই খুলে বললেন। এ স্বপ্নের মীমাংসা তাঁর বিদ্যাবুদ্ধি এবং শক্তির অতীত। এই অপূর্ব স্বপ্নের যথার্থ মীমাংসা করতে পারেন—স্বপ্নে যে ভিক্ষুকে তিনি দেখেছেন একমাত্র তিনিই। তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং বুদ্ধ,—মহারাজের এই নগরপ্রান্তে আম্রকাননে যিনি বাস করছেন।

—তিন—

ব্যাপারটা বুঝতে রাজার আর বিলম্ব হ'ল না। কিন্তু তিনি কেমন ক'রে সেই নাস্তিক, ব্রাহ্মণ্যধর্মের মহাশত্রুর কাছে স্বপ্ন-মীমাংসায় সাহায্য নিতে যাবেন? তা'ছাড়া মহারাজ তিনি! এতবড় একটা রাজ্যের স্বামী হয়ে একজন ভিক্ষুর কাছে যাবেন কি ক'রে—তাঁর আত্মসম্মানে আঘাত লাগবে যে! অথচ স্বপ্ন-মীমাংসার জন্য তাঁর প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। আবার এটাও ভাবছেন,—

বুদ্ধ তাঁর কাছেই আছেন, তাঁকে খুজতে মহারাজকে কোন অনিশ্চিত স্থানে যেতে হবে না। কিন্তু কাকেই বা পাঠানো যায় এ-কাজে, নিজে ত' আর যেতে পারেন না,—তাঁর মাথায় যে রাজমুকুট!

ভেবে-চিন্তে মহারাজ বললেন,—আচার্যদেব, আপনিই যান তাঁর কাছে, স্বপ্নের মীমাংসা জেনে আসুন।

আদেশ শুনে আচার্য ম্রিয়মাণ হয়ে পড়লেন। কতক্ষণ পরে তিনি বললেন,—মহারাজ, প্রাণ দিয়েও আপনার আদেশ পালন করতে আমরা সর্বদাই প্রস্তুত। কিন্তু আমাদের ব্রাহ্মণ-সমাজের যে এতে মহা অপমান হবে, তা' কি মহারাজ ভেবে দেখেন নি? আপনি ব্রাহ্মণের রক্ষক; বুঝে দেখুন, ব্রাহ্মণ-সমাজের মতামত না জেনে আমি কি ক'রে তাঁর কাছে যেতে পারি—এটা যে ধর্মবিরুদ্ধ কাজ হবে, মহারাজ! একান্তই যদি যেতে হয় ত' আপনার নিজেরই যাওয়া উচিত। ভেবে দেখুন, আপনার উদ্দেশ্য আর তার গুরুত্ব বিচার ক'রে দেখলে আপনার যাওয়া অশোভন হবে না। তা'ছাড়া, আপনি রাজা,—আপনার অধিকার নিয়ে কারও কথা চলবে না।

রাজা পুনরায় ভেবে দেখলেন,—ব্রাহ্মণের কথাই যুক্তিযুক্ত, রাজা বা ভূস্বামী ব'লে অভিমানের কথা ছেড়ে দিলে কোন বাধাই ত' নেই তাঁর কাছে যাবার,—তাঁর যাওয়াই ত' উচিত। এই কথা ভাববার সঙ্গে সঙ্গেই এক অনির্বচনীয় প্রেরণা তিনি অন্তরে অনুভব করলেন। তিনি আচার্যকে এসে বললেন,—তা'হ'লে সেই ভাল, আচার্যদেব। আমিই যাব, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

শুনে আচার্য সত্য সত্যই একটা গভীর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

আসল কথা, রাজার মহাভাগ্যের যোগ উপস্থিত। মহাপুরুষের কৃপায় তাঁর মনের মেঘ কেটে গেল। চিত্ত হল নির্মল, দ্বিধাশূন্য।

মহাপুরুষের প্রভাব যে এই ভাবেই যোগ্যজনের মনের ওপর কাজ করে, এ কথা তিনি তাঁর দর্শন পাবার পরেই বুঝেছিলেন। আরও বুঝেছিলেন, তাঁর সৌভাগ্যের সীমা নেই, তাঁকে কৃপা করতেই ভগবান বুদ্ধ তাঁর এত কাছে, তাঁর গৃহদ্বারে এসে অপেক্ষা করছেন।

যাহোক্, এখন রাজা অধৈর্য হয়ে পড়লেন ভগবান বুদ্ধের দর্শন-লাভের জন্য ; তাঁর আর যেন তর সইছিল না। তিনি আর বিলম্ব না ক'রে একজন মাত্র পার্শ্বচর সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

এদিকে নগরোপান্তে আম্র-কাননে ভগবান্ বুদ্ধ তাঁর আসনে ব'সে তাঁর পরম ভক্ত আনন্দের সঙ্গে কথা কইছিলেন। আনন্দ জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবন্, আজ আপনাকে বিশেষ রূপে প্রফুল্ল দেখে আমাদের মনে অপার সুখ উপস্থিত হয়েছে।

উত্তরে তথাগত বললেন,—দেখ আনন্দ, আজ এখানে রাজ-অতিথি আসছেন। বিদিশা-ঈশ্বর মহারাজ শত্রুজিৎ আজ আসছেন তোমাদেরই একজন হবার জন্যে। তোমরা সানন্দে তাঁকে অভ্যর্থনা কর—সত্য সত্যই আজ বড় শুভ দিন।

—চার—

যথাসময়ে মহারাজ যখন উদ্যান-তোরণের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন তিনি আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে, আনন্দ-প্রমুখ ছয়জন ভিক্ষু তাঁকে সমাদরে ভগবৎসকাশে নিয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা

করছেন। তারপর যখন শুনলেন যে, তাঁরা ভগবান্ বুদ্ধের আদেশেই মহারাজকে নিয়ে যেতে এসেছেন, তখন মহারাজের বিস্ময়ের সীমা রইল না,—তিনি ত' দুদণ্ড আগেও নিজেই জানতেন না যে, তিনি এখানে আসবেন। তবে কি ইনি অন্তর্যামী মহাপুরুষ !

তারপর তিনি পদব্রজে যখন ভগবান্ বুদ্ধের সাক্ষাতে এসে পৌঁছুলেন, তখন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন তাঁর মূর্তি দেখে—এ যে সেই স্বপ্নে-দেখা ভিক্ষু ! তাঁর গায়ে তখন কাঁটা দিয়ে উঠল !

নমো নারায়ণায়—ব'লে তিনি প্রণাম করতে গেলেন ; কিন্তু কৃতার্থ হ'লেন তাঁর আলিঙ্গন পেয়ে। ঠিক সেই সময়ে তাঁর দক্ষিণ বাহুর উপরের দিকটা নেচে উঠল, তিনি চক্ষু মুদ্রিত করলেন।

রাজা উপবেশন ক'রে মাথা থেকে উষ্ণীষ খুলে পাশে রাখলেন, তারপর বললেন—আজ আমি ধন্য হলেম, ভগবন্ ! আজ আমার জীবন সার্থক।

বুদ্ধদেব প্রসন্ন মুখে বললেন,—বৎস, যে অদ্ভুত স্বপ্ন আজ তোমাকে আমার কাছে এনেছে, প্রথমে তারই মীমাংসা হয়ে যাক্। আজ ক'দিন থেকেই তুমি বড় মানসিক উদ্বেগ ভোগ করছ, নয় কি ?

মহারাজ এখন নিশ্চিত বুঝতে পারলেন, বুদ্ধদেব কখনোই সামান্য ভিক্ষু ন'ন,—এই মহাপুরুষ কখনও কোনো ব্যক্তি বা কোনো ধর্মের শত্রু ন'ন, হ'তে পারেন না। এ জগতে তাঁর শত্রু নেই, থাকতে পারে না। এই মহাপ্রাণের সংস্পর্শে এলে কারও অন্তরে আর মিথ্যার অন্ধকার থাকতে পারে না।

—পাঁচ—

ব্রাহ্মণ্যধর্মের রক্ষক, বৌদ্ধধর্মদ্বেষী মহারাজ শক্রজিৎ তখন বলতে লাগলেন,—প্রভু, যদিও স্বপ্ন-মীমাংসা উপলক্ষেই আজ এখানে এসেছি, কিন্তু এখন আর সে-কথা মনে হচ্ছে না। আপনার দর্শনে এখন আর আমার মনে কোনো প্রশ্নই উঠছে না।

তথাগত বললেন,—তা' কি হয়? আগে সেটার মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন। কারণ, তার মধ্যেই তোমার জীবনের শুভাশুভ নির্ভর করছে। এই স্বপ্নের অনুসারেই যে তোমাকে তোমার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ণয় করতে হবে! তুমি এখনই বল তোমার স্বপ্নকথা।

আনন্দ-প্রমুখ ভক্তদের উদ্দেশ করে ভগবান্ বুদ্ধ বললেন,—ভিক্ষুগণ, বিদিশা-রাজের অদ্ভুত স্বপ্নবৃত্তান্ত তোমরাও শোনো, অবহিত হও; কারণ তোমাদেরও এর মধ্যে কিছু জানবার বিষয় রয়েছে।

সকলেই একান্ত মনোযোগ সহকারে শুনতে লাগলেন, সকলের মধ্যেই একটা মহা কৌতূহল দীপ্ত হয়ে উঠল। মহারাজের চোখে-মুখে বিস্ময় ঘনীভূত হ'তে লাগল।

প্রথম স্বপ্ন শুনে ভগবান্ বুদ্ধ বললেন,—তোমার শৌর্য-বীর্য এবং রাজশক্তির বিকাশ পূর্ণরূপেই হয়েছে,—বর্তমান উন্নতির পরাকাষ্ঠা নির্দেশ করছে তোমার এই প্রথম স্বপ্ন। তুমি এখন জীবনে বুদ্ধি বা সৌভাগ্যের উচ্চতম শিখরে সমাসীন।

দ্বিতীয় স্বপ্নের উত্তরে বুদ্ধদেব বললেন,—তোমার সৌভাগ্যলক্ষ্মী আরও সাতটি বৎসর পূর্ণভাবেই থাকবেন। এটি তারই ইঙ্গিত জেনো।

তৃতীয় স্বপ্নের মীমাংসায় তথাগত বললেন,—এই সাত বৎসর অতীত হ'লে তোমার এক শত্রু রাজা তোমার রাজ্য আক্রমণ করবে। অবশ্য তোমায় সে-জন্য বেশী উদ্বেগ ভোগ করতে হবে না,—সে নিজেই তার অসুবিধে ডেকে আনবে, শেষে পরাজিত ও ভগ্নমনোরথ হয়ে প্রস্থান করবে। এক প্রাকৃতিক দুর্যোগই তোমায় বাঁচিয়ে দেবে। এ স্বপ্নের এই অর্থ জানবে।

চতুর্থ স্বপ্নের বিচারে ভগবান্ বুদ্ধ বললেন,—বৎস, তারপর তিন বৎসর ধ'রে তোমার রাজ্যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে,—এটি তারই সঙ্কেত। সুতরাং এখন থেকে তার প্রতিবিধানের চিন্তা কর, প্রস্তুত হও।

শেষ স্বপ্ন সম্পর্কে বুদ্ধদেব বললেন,—বৎস, তোমার জীবন মহাশক্তিশালী, অপূর্ব, আদর্শ জীবন। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গই তোমার করতলগত। ধন্য তোমার জীবন! হ্যাঁ, যা বলছিলাম—ঐ দুর্ভিক্ষের পর তোমার জীবনে নির্বেদ আসবে এবং তোমায় শেষে ভিক্ষুর জীবন গ্রহণ করতে হবে। সার্থক তোমার জন্ম, বৎস! তোমার নির্বাণ লাভ হোক্,—তোমাকে আজ সর্বান্তঃকরণে এই আশীর্বাদই করছি।

—এক—

সেকালের কথা। সেকাল, অর্থাৎ যেকালে ভারত অধীনতার রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত ছিল, যেকালে এই সোনার ভারতভূমির সকল প্রদেশই ছিল সুখেসম্পদে ধন-ধান্যে ভরা, আনন্দের অনাবিল অজস্রতায় উচ্ছল। তখন স্বাধীন ভারতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যেমন প্রসার ছিল, তেমনই ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার; কৃষি-সম্পদের বাহুল্যও দেখা যেত সর্বত্রই। রাজা ছিলেন প্রজার পিতা, প্রজা ছিল রাজার সন্তান। রাজার পুত্র, মন্ত্রীর পুত্র, কোটাল অথবা নগরপাল ও সওদাগরের পুত্র ছিল অখণ্ড বন্ধুত্বে আবদ্ধ—যেমন ছিলেন রাজা, মন্ত্রী, বণিক্‌, শ্রেষ্ঠী, সেনাপতি পরম প্রীতিতে বাঁধা। তাঁদের সকল খেলা, আমোদ-প্রমোদ, মৃগয়াদি এই সকল পদস্থ বন্ধুদের বাদ দিয়ে কখনোই হ'তে পারত না।

সেই সময় ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তদেশে ছিল পরম সুন্দর, ধনশালী, প্রজাপূর্ণ, সুখ-সৌভাগ্যে অতুলনীয় এক রাজ্য। এই রাজ্যের নাম ছিল অশ্বকোট। অদ্রিপাল ছিলেন তার রাজা। তাঁর রাজধানীতে নানা দেশ থেকে সওদাগর, বণিক্‌, রত্নবণিক্‌, বহু

ব্যবসায়ী মহাজন নিত্যই আনাগোনা করত এবং বহুবিধ বাণিজ্য-দ্রব্য আদান-প্রদান-কালীন উচ্চ শব্দে দিবারাত্র নগরটি মুখরিত থাকত।

তখনকার দিনে ঘোড়ার ছিল বড় মান। স্বয়ং রাজা থেকে সুরু ক'রে সাধারণ প্রজা পর্যন্ত সকলেরই আকর্ষণের বস্তু, আদরের ধন ছিল ঘোড়া। অবশ্য গোরু আর ঘোড়া এই তু'টিই ছিল তখনকার মানব-সমাজের প্রধান অবলম্বন—গোধনই বোধ হয় ছিল সর্বপ্রধান, তার ঠিক পরেই ছিল ঘোড়ার প্রয়োজনীয়তা। গোরু-বলদ না হ'লে যেমন কোনো গৃহস্থেরই সংসার চলত না, তেমনি ঘোড়া না হ'লেও তখনকার সমাজ চলা ভার ছিল। জলে অর্থাৎ নদীতে বা সাগরে যেমন নৌকাই ছিল প্রধান বাহন, ডাঙায় তেমনি ছিল ঘোড়া। তা' রথ টানতেই হোক্ বা দূর গমনাগমনের কাজে অথবা যুদ্ধের সওয়ার নিতেই হোক্, ঘোড়া না হ'লে কারোই চলতো না—বিশেষত, যাদের ছিল দূর-দূরান্তরের দেশের সঙ্গে কাজ-কারবার কিংবা শীঘ্র শীঘ্র কোথাও যাবার দরকার। আর রাজার ত' ঘোড়া না হ'লে এক মুহূর্তও চলত না—যুদ্ধের সময়েও যেমন, অন্যান্য কাজের জন্যেও তেমন। তা'ছাড়া নানা কাজে—যেমন, নানা স্থানে রাজ্য-সংক্রান্ত সংবাদ আদান-প্রদান, মৃগয়াদি ক্রীড়া, ঘোড়দৌড় এবং রথচালনার প্রতিযোগিতা, মোট কথা সকল কাজেই—সেকালে ঘোড়ার ব্যবহার ছিল সভ্য সমাজের প্রধান অঙ্গ।

নানা দেশ থেকে অশ্বব্যবসায়ীরা আসত ভারতে, তাদের সংগৃহীত অশ্ব বিক্রী করার জন্যে। ভারতের মধ্যে যেখানে-যেখানে ঘোড়া পাওয়া যায়, রাজা ত' সেই সব জায়গায় লোক পাঠিয়ে সেগুলি সংগ্রহ করতেনই, তা' ছাড়া বাইরে থেকে, অর্থাৎ ভারত-প্রান্তের

গান্ধার, ইরাণ, আরব, তুরাণ প্রভৃতি দেশ থেকে, যেসব উঁচু দরের ঘোড়া আসত তাও সংগ্রহ করতেন—যেমন আজকের দিনেও রাজা, মহারাজা, বড় বড় লোকেরা ক'রে থাকেন। সেসব ঘোড়াও রাজারা খুব চড়া দাম দিয়েই সংগ্রহ করতেন।

আমরা এখন যে-সময়ের গল্প বলছি সেই সময়ে অশ্বকোট রাজ্যের রাজধানীতে এসেছিল একজন বিদেশী অশ্বব্যবসায়ী, কতকগুলি উত্তম অশ্ব বিক্রয় করার জন্যে। প্রত্যেক জিনিষেই রাজার অধিকার সর্বাগ্রে, তাই তাঁর কাছেই এই খবরটা গেল সর্বপ্রথম, যেহেতু নিয়ম এইরকমই ছিল। ব্যবসায়ীরা, তাদের যা-কিছু পণ্য আগে রাজাকে দেখাত। রাজা তাঁর প্রয়োজন এবং ইচ্ছামত জিনিষ নেবার পর তবেই অপরের কিছু নেবার অধিকার ছিল; যেহেতু, সকল বিষয়েই রাজার অগ্রভাগ, এই ছিল সেকালের প্রথা। এক্ষেত্রেও রাজা স্বয়ং দেখে শুনে বেছে বারোটি উত্তম মনোমত হৃষ্টপুষ্ট ঘোড়া নিলেন। আর তাদের উপযুক্ত সুবর্ণমূল্যও দিয়ে দিলেন। রাজার পছন্দ হয়ে যাবার পর অবশিষ্ট আরও কতকগুলি ঘোড়া ছিল; তার মধ্যে একটা ছিল বেশ লম্বা ধরণের, পাত্‌লা ছিপছিপে—মনে হয় খুবই দুর্বল। তার গায়ের রংটা ছিল কতকটা হাল্‌কা নীল—অনেকটা জলভরা মেঘের মত। তার পাগুলোর রং ছিল সোনার মত, কিন্তু সেগুলো ছিল খুবই সরু; তার কপালে ছিল চাঁদ, সুদীর্ঘ ছিল তার পুচ্ছ। কেউ কিন্তু গ্রাহ্য ক'রে তার দিকে চেয়েও দেখে নি। বিদায় নেবার সময় সেই সওদাগর জোড় হাতে রাজাকে এই নিবেদন করলে,—মহারাজ! যে ঘোড়াগুলো আপনি নিজে বেছে খরিদ করেছেন সেগুলো অবশ্য খুবই ভাল আর উঁচু জাতের ঘোড়া, কিন্তু তার

চেয়ে বহুগুণে উৎকৃষ্ট আর অদ্ভুত একটি ঘোড়া আমার কাছে আছে। তার উপযুক্ত অধিকারী মনে ক'রে আপনাকেই সেটা আমি দিতে চাই।

তার মূল্য কত—মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন।

মহারাজ! এর দাম হ'ল এক সহস্র সুবর্ণ নিস্ক।

শুনে রাজা হাসলেন, ঐ রোগা পাত্‌লা নীল ঘোড়াটা— কোনও আকর্ষণই যার নেই—তার এই দাম!

রাজা ভাবলেন—আমি যদি ওর পিঠে উঠি, হয়ত' বেচারার শিরদাঁড়াটাই ভেঙ্গে যাবে। কি হবে ঐ জঞ্জাল নিয়ে?

যুবরাজ সেখানে ছিলেন; তাঁর কেমন মায়া হল ঐ অদ্ভুত দুর্বল-শরীর জীবটার ওপর। রোগা বটে, কিন্তু ওর বড় বড় উজ্জ্বল চোখের ঘন কালো তারা দুটোর দিকে তাকালে কেমন যেন একটা মায়া, একটা আকর্ষণ বোধ হয়; তা' ছাড়া, তাঁর কৌতূহল যত, আগ্রহও তত জন্মাল ওটাকে নিজস্বভাবে অধিকার করার জন্যে। তিনি জেদ ধরলেন—ঐ ঘোড়াটা আমার চাই। কাজেই সেটাও নেওয়া হ'ল। যাবার সময় অশ্ববিক্রেতা এই কথা ব'লে গেল,—দেখবেন কুমার, এই ঘোড়াটিকে যেন পৃথক্ একটা পবিত্র জায়গায় রাখা হয়। কোন ঘোড়ার সঙ্গে, অথবা আগে ব্যবহার করা হয়েছে এমন কোন অপরিষ্কৃত জায়গায় যেন রাখা না হয়।

তাই হ'ল। যুবরাজের অশ্বশালার পাশেই নূতন একটা জায়গায় এই অদ্ভুত ঘোড়াটার জন্যে আস্তাবল তৈরী করা হ'ল এবং ভাল একটি অশ্বরক্ষকও নিযুক্ত হ'ল যাতে ঐ বেচারা জীবটা নিয়মিত সেবা পায় আর বেশ সুখে থাকতে পারে। সে যাতে রোজই কচি কচি উৎকৃষ্ট শস্য, কচি কচি দূর্বাদল, নবপল্লবিত

তরুশাখা, আর যাতে আশু পুষ্টির সম্ভাবনা এমন সব খাদ্য পায়, তার ব্যবস্থা ক'রে যুবরাজ নিশ্চিন্ত হ'লেন। এই দুর্বল জীবটাকে সেবা-যত্ন দিয়ে শীঘ্র শীঘ্র হৃষ্টপুষ্ট ক'রে দিতে পারলে অশ্বপালককে বিশেষরূপে পুরস্কৃত করা হবে—এ ব্যবস্থাও হ'ল।

কিন্তু আশ্চর্য,—ঘোড়াটা খায় খুব কম। এইভাবে দু'মাস কেটে গেল। ঘোড়াটার শরীরের অবস্থা একই রকমের রইল, হ্রাস-বৃদ্ধি কিছুই দেখা গেল না। কোন পরিবর্তন লক্ষ্য না ক'রে মনে মনে যুবরাজ কিছু ক্ষুণ্ণ হলেন, তাঁর মনে হ'তে লাগল, আর কিছুদিন দেখে ওটাকে বিদায় ক'রে দেবেন। যাই হোক্, এমনি ক'রে আরো দু'মাস কাটল।

—দুই—

একদিন কি মনে হ'ল, খেয়ালের বশেই, দ্বিপ্রহরের বিশ্রামের পর তৃতীয় প্রহরে আস্তাবলে এসে রাজকুমার ঘোড়াটাকে খুললেন, আর সহিসকে সাজ, জিন পরাতে বললেন। সব ঠিক হ'লে, লাগাম ধ'রে আস্তে আস্তে ঘোড়াটাকে নিয়ে চললেন, তাঁর বাঁ হাতে এক গাছা শঙ্কর মাছের ন্যাজের চাবুক। তখন বিশ্রামের সময়, চারিদিক নিঝুম, কেউ কোথাও নেই। তাঁকে কেউ ঐ ঘোড়াটায় চড়তে দেখতে না পায় এমন এক নিরিবিলি জায়গায় গিয়ে কুমার দাঁড়ালেন। লাফিয়ে তার পিঠে উঠলে পাছে বেচারার মেরুদণ্ডে লাগে, তাই তিনি রেকাবে পা দিয়ে বেশ সংযত ভাবেই আসনে বসতে গেলেন। কিন্তু বসবার সঙ্গে সঙ্গেই তার বেগ সামলান বেশ মুশ্‌কিল হ'ল তাঁর মত একজন দক্ষ অশ্বারোহীর পক্ষেও। ঘোড়াটা পেছনের দুটো পায়ে

…পেছনের দুটো পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে এমন ভীষণ চিঁ-হিঁ-হিঁ শব্দ করলে… (পৃঃ ৬১-৬২)

একবার দাঁড়িয়ে উঠে, এমন ভীষণ চিঁ-হিঁ-হিঁ শব্দ করলে যে তা' শুনে বুক কেঁপে উঠল রাজকুমারের ; তারপর, মন-বুদ্ধি স্তম্ভিত ক'রে দিয়ে, দৃশ্যত দুর্বল সেই অপূর্ব বাজী দুরন্ত বেগে উধাও ছুট দিল। রাজকুমার জীবনে কখনো কোন ঘোড়ার এমন গতিবেগ দেখেন নি, শোনেন নি, অনুমানও করেন নি। ঘোড়াটা যেন উড়েই চলেছে। সত্যই রাজকুমারের বোধ হ'তে লাগল যেন তার পা মাটিতে ঠেকছে না। কারণ, অত দ্রুতগতি সত্ত্বেও কই মাটিতে তার পায়ের আঘাত জনিত কোনও শব্দ ত' উৎপন্ন হচ্ছে না! সোজা খাল বিল, এমন কি ছোট পার্বত্য নদী পর্যন্ত অবলীলাক্রমে লাফ দিয়ে পেরিয়ে চলল ঐ অদ্ভুত ঘোড়া। ওর বেগের সঙ্গে তুলনা করতে গেলে উল্‌কা বা বিদ্যুতের কথাই মনে হয়,—তা' ছাড়া সে বেগের সঙ্গে অন্য কিছুর তুলনা করা যায় না। রাজকুমার ভাবছেন,—এ কি অদ্ভুত ঘোড়া! কেমন ক'রেই বা এর পিঠের ওপরে আসনে স্থিরভাবে ব'সে থাকব! ব'সে থাকাটা ক্রমেই যেন তাঁর অসম্ভব ব'লে মনে হ'তে লাগল। সেই সঙ্গে শঙ্কর মাছের ন্যাজের প্রকাণ্ড চাবুকটার কথা মনে হ'তেই লজ্জায় তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠল। সেটা তখনই ফেলে দিয়ে তিনি দু'হাতে ঘোড়াটার গলা জড়িয়ে ধ'রে রইলেন প্রাণপণ শক্তিতে। উত্তর-পূর্ব কোণের দিকেই চলছে ঘোড়া, সোজা—একেবারে তীরের মত। ঘোড়াটা যেন একেবারে উড়ে যাচ্ছে, উত্তরোত্তর বেগ যেন তার বেড়েই চলেছে। এইভাবে যে কতক্ষণ চলছিলেন তার জ্ঞান ছিল না কুমারের। রাজকুমারের দম বন্ধ হয়ে আসছিল,—আর তিনি পারেন না ঘোড়ার পিঠে বসে থাকতে, বোধ হয় এবার পড়তেই হবে! হয়ত' প'ড়েও যেতেন তিনি, কিন্তু তাঁর অবস্থা বুঝেই যেন ঠিক সেই সময়েই ঘোড়াটা একেবারে সোজা চারপায়ে দাঁড়িয়ে গেল।

তৎক্ষণাৎ কুমার আসন থেকে নেমে পড়লেন। আঃ! তিনি যেন বাঁচলেন!

—তিন—

রাজপুত্র ত' অবাক্,—এ কোথায় তিনি এসে পড়েছেন! চারিদিক দেখে তাঁর মনে ভয়ও বড় কম হ'ল না। জায়গাটা দেখতে একটা পাহাড়ের চূড়োর মতই—কিন্তু খানিকটা বিস্তৃত ভূমিও রয়েছে, আর তার মাঝে মাঝে রয়েছে ছোট-বড় নানারকমের অদ্ভুত গাছপালা। চারিদিকে গাঢ়নীলবনানী-সঙ্কুল পর্বতমালা স্তরে স্তরে উর্ধ্বে, আরো উর্ধ্বে উঠে গিয়েছে! সেই ক্রমোন্নত পর্বতমালা থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলেন রাজকুমার—কিন্তু এ কী! রাজপুত্র ফিরে দেখেন, ঘোড়াটা আর নেই। দূরে, বহুদূরে তার পশ্চাদ্ভাগ দেখা গেল, দেখতে দেখতে বনান্তরের গাছপালার মধ্যে সে মিশিয়ে গেল। কিন্তু, কোথায় গেল ওটা?

এখন, এদিকে অশ্বকোট রাজ্যে কি হ'ল? যে সহিস ঘোড়াটাকে সাজিয়ে দিয়েছিল কুমারের জন্যে, অনেকক্ষণ পর সে অবাক্ হয়ে দেখলে, ঘোড়াটা ফিরে আসছে। পশ্চিমে তখন সূর্যদেব ঢ'লে পড়েছেন আকাশের কোলে। ঘোড়াটা দ্রুতগতিতে তার নিজের জায়গায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তার সাজ-বেশ সব ঠিকই আছে। কেবল রাজপুত্র নেই তার পিঠে। এ কেমন হ'ল? সহিস বেচারা ভয় পেয়ে গেল; দৌড়ে গিয়ে পুরীর মধ্যে খবর দিলে যে, রাজপুত্র ঐ দুর্বল ঘোড়াটার পিঠে চড়ে গিয়েছিলেন কতকক্ষণ আগে; এখন ঘোড়াটা ফিরে এসেছে, কিন্তু রাজপুত্রের কোন উদ্দেশ

নেই। রাজা, মন্ত্রী, মন্ত্রিপুত্র সুবল ইত্যাদি সকলেই মহা উদ্বেগে ঘোড়াটার কাছে এসে হাজির হ'লেন, যেন তাকে জিজ্ঞাসা করলেই সব খবর পাওয়া যাবে। কিন্তু ঘোড়াটা কোন আভাসই দেয় না, কেবল ঘন ঘন এদিক্ ওদিক্ তাকাতে থাকে।

মহারাজের আদেশে চারজন সওয়ার তখুনি বেগবান্ ঘোড়ার ওপর উঠে চারিদিকে ছুটল রাজকুমারের তত্ত্ব করতে। রাজা মনে মনে খুবই উদ্বিগ্ন হলেন, কিন্তু মুখে কিছুই বললেন না। হঠাৎ মন্ত্রিপুত্র সুবল জোড়হাতে রাজাকে নিবেদন করলেন,—মহারাজ, আমার মনে হয় ও ঘোড়াটা দেখতে যেমন—যথার্থই ও তা' নয়। আমার ধারণা যা' তা' পরে বলব। এখন, মহারাজের অনুমতি পেলে আমি ওর পিঠে চড়ে এখুনি যাত্রা করি। আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না মহারাজ, যত শীঘ্র সম্ভব আমি রাজকুমারের উদ্দেশ নিয়ে ফিরে আসব।

মহারাজ সম্মত হলেন, না হয়েও উপায় ছিল না—কারণ, তাঁর উদ্বেগ, আশঙ্কা তাঁকে বড় অস্থির ক'রে তুলেছিল।

যেই তার পিঠে চড়া, অমনি ঘোড়াটা পেছনের দুটো পায়ে সেইরকম দাঁড়িয়ে উঠে একবার ভয়ঙ্কর হুঙ্কার ক'রে উঠল,—আর মন্ত্রিপুত্র সুবল আসনে স্থির হয়ে বসবার আগেই বায়ুবেগে উধাও হয়ে গেল। বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে সকলেই দেখলে যে, ঘোড়াটার পা যেন মাটিতে ঠেকছে না, যেন সে উড়ে চলেছে শূন্যকে অবলম্বন ক'রে। স্তম্ভিত হয়ে এই অদ্ভুত যাত্রা দেখতে লাগল সকলে। চোখের নিমেষে এ-রকম উধাও যাত্রা কেউ দেখে নি কোনদিন।

কুমারকে যেখানে পৌঁছে দিয়ে ঘোড়াটা ফিরে গিয়েছিল অশ্বকোটে, এবারও ঠিক সেই জায়গাতে পৌঁছেই সে দাঁড়িয়ে পড়ল,—

মন্ত্রিপুত্রকে বিস্ময়ে অবাক্ ক'রে দিয়ে। আরও আশ্চর্য এই যে, তার পিঠ থেকে মন্ত্রিপুত্র সুবল নামা-মাত্রই ঘোড়াটা যেন অদৃশ্য

হয়ে গেল। বিস্ময়ে হতবাক্ সুবল স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর ধারণা হ'ল, রাজকুমারও ঠিক এইভাবেই এইখানে এসেছেন। একটা সহজ সংস্কার বশেই তিনি 'রাজকুমার', 'রাজকুমার' ব'লে

উচ্চস্বরে সেই কাননভূমি প্রতিধ্বনিত ক'রে ডেকে উঠলেন। তৃতীয় বারে যেন একটা ক্ষীণ সাড়া পাওয়া গেল—কে? বন্ধু সুবল?

সাড়া লক্ষ্য ক'রে খানিকটা এগিয়ে যেতেই সুবল রাজকুমারের সাক্ষাৎ পেলেন। রাজকুমারও তখন এগিয়ে আসছিলেন বন্ধুর সন্ধানে। এই অপ্রত্যাশিত মিলনে দুই বন্ধুর অন্তর অনির্বচনীয় আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল। সেই বিচিত্র পার্বত্য পরিবেশ অকৃত্রিম বন্ধুত্বের মিলন-মাধুর্যে মধুরতর হয়ে উঠল।

অনেকক্ষণ পরে রাজকুমার বললেন,—ভাই, এই অদ্ভুত ঘোড়াটা আমায় একেবারে অবাক্ ক'রে দিয়েছে। এমন অদ্ভুত অবিশ্বাস্য ঘটনা কি কেউ কখনও দেখেছে, না শুনেছে?

সুবল বললেন,—আমার বোধ হয় ঘোড়াটা এবার পিতাকে নিয়ে আসবে।

ওদিকে ঘোড়াটা আবার অশ্বকোটে ফিরে ঠিক তার জায়গাটাতেই গিয়ে দাঁড়াল। এবার মন্ত্রী বললেন,—মহারাজ! এবারও দেখছি ঘোড়াটা একাই ফিরে এসেছে। যাই হোক্, আপনার অনুমতি হ'লে এবার আমি নিজেই যাব আর এখুনি এর তত্ত্ব নিয়ে ফিরে আসব, আপনি কোন চিন্তা করবেন না। সুবল ও কুমার বালকমাত্র; ও তাদের ভুলিয়ে রেখে আসতে পারে, তাদের সঙ্গে ও শঠতা করতে পারে; কিন্তু আমি বৃদ্ধ, প্রবীণ—অনেক দেখেছি, যত চালাকই হোক্ আমাকে ও ভোলাতে পারবে না।—এই ব'লে উঠলেন ঘোড়াটার পিঠে আর সেও পূর্ব পূর্ব বারের মতই নিমেষে উধাও হয়ে গেল,—রাজা দেখে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেলেন। তাঁর আশঙ্কা বড় কম হ'ল না। ভাবলেন—এ আমার কী হ'ল! প্রথমে পুত্র হারালাম, তারপরে হারালাম রাজপুত্রের অভিন্নহৃদয় বন্ধু মন্ত্রিপুত্র সুবলকে।

তারপর আমার প্রাণের অধিক রাজ্যের মূর্তিমান্ কল্যাণস্বরূপ মন্ত্রী—তাঁকেও হারালাম। কি কুক্ষণেই যে ঘোড়াটাকে রেখেছিলেন রাজকুমার! হায়! হায়!

ওদিকে ঠিক জায়গায় সুবল ও রাজকুমার মন্ত্রীর জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। অবতরণ মাত্রই রাজকুমার ও সুবল মন্ত্রীকে প্রণাম করলেন, মন্ত্রীও স্বস্তিবাচন ক'রে কুশল প্রশ্ন করলেন,—ইতিমধ্যে পবনবেগে পক্ষিরাজও অদৃশ্য হয়ে গেল।

—চার—

এবার রাজার পালা। অল্পক্ষণেই রাজাকে পিঠে ক'রে এনে সেই জায়গায় হাজির ক'রে দিলে পক্ষিরাজ। কিন্তু এবার সে আর অদৃশ্য হ'তে পারল না—অদৃশ্য হবার আগেই বিচক্ষণ মন্ত্রী তার লাগামটা ধ'রে একটা গাছের সঙ্গে তাকে বেঁধে ফেললেন, যাতে সে আর পালাতে না পারে। কারণ, এবার তাকে হারালে তাঁদের চলবে না। তারপর চারজনে স্থির হয়ে পরামর্শ করতে বসলেন।

সকলের মনেই প্রবল বিস্ময়। এখন কি করা যায়? এ সমস্যার সমাধান হঠাৎ কারো মনে এল না। রাজা বললেন,—মন্ত্রী, আমার কোন বুদ্ধি যোগাচ্ছে না। কেবলই মনে হচ্ছে যদি সেই গান্ধারবাসী অশ্বব্যবসায়ীকে পেতাম, তা'হ'লে ঘোড়াটার সম্বন্ধে তার কাছ থেকে ঠিক খবর জেনে নিতে পারতাম।

মন্ত্রী বললেন,—কিন্তু, মহারাজ, তাতে উপস্থিত কি করা উচিত তার ত' মীমাংসা হ'ল না। পিতাকে উদ্দেশ করে তখন রাজপুত্র বললেন,—তাত! একবার এ জায়গাটায় অনুসন্ধান ক'রে দেখলে

হয় না? আমাদের চারজনকে এখানে এনে ফেলার মধ্যে কোন একটা দৈব উদ্দেশ্য রয়েছে ব'লেই আমার মনে হচ্ছে। মন্ত্রিপুত্র সুবল বললেন—আমারও তাই মনে হয়। এই জায়গাটাতে এমন কিছু আছে, যা ঐ ঘোড়াটার পরিচিত। মনে হয় এটা তার অতি প্রিয় স্থান। নিশ্চয়ই এই স্থান তার জীবনের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ ভাবেই জড়িত ;—তা' ছাড়া ও যখন আমাদের এখানে এনেছে তখন এর মধ্যে যে একটা গভীর রহস্য আছে সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। কুমার, এসো, আমরা দুজনে এদিকে যাই, দক্ষিণ দিক্‌টা অনুসন্ধান করি। আর মহারাজা আর পিতা উত্তর দিকে যান, ওদিকে গিয়ে অনুসন্ধান করুন। কিছু-না-কিছু সন্ধান আমরা নিশ্চয়ই পাব।

এই পরামর্শ সকলেই সমীচীন ব'লে মনে করলেন। মহারাজ সুবলকে সাধুবাদ দিয়ে বললেন,—ততক্ষণ আমাদের সকল রহস্যের মূলাধার এই পক্ষিরাজটি এখানেই বাঁধা থাক্। ওকে হারালে আমাদের চলবে না।—ব'লে মন্ত্রীর সঙ্গে মহারাজ উত্তর দিকে চললেন। খানিক দূর গিয়ে মহারাজ বললেন,—মন্ত্রী, বলতে পার এ কোন্ রাজ্যে এলাম আমরা? কি মনে হয় তোমার? আগে কি এদিকে কখনও এসেছ? আমার মনে হয়, এটা নিশ্চয়ই কোন মায়ারাজ্য—তা' না হ'লে এখানে এত নীল রংয়ের ছড়াছড়ি কেন? যে দিকেই চোখ পড়ে সেই দিকেই যেন নীলবর্ণের খেলা, দেখছ না?

মন্ত্রী বললেন,—না মহারাজ, এত চট্ ক'রেই মায়ারাজ্য ব'লে এটাকে মানতে আমি প্রস্তুত নই। তারপর চিন্তিত মনেই বললেন—আমার মনে হয়, আমাদের রাজ্য থেকে এই পর্বতরাজ্য অনেকটা দূর, তবে দূরত্ব যে ঠিক কতটা সে-সম্বন্ধে সঠিক ধারণা

আমি করতে পারছি না। মনে হয় হিমালয়ের মধ্যস্তরের কোন এক স্থানে আমরা এসে পৌঁছেছি।

আশ্চর্য হয়ে মহারাজ বললেন,—হিমালয়ের মধ্যস্তর? কি এমন দেখতে পেলে তুমি, যাতে এই ভয়ঙ্কর স্থানটাকে হিমালয়ের মধ্যস্তর ব'লে ধারণা করছ? বল, মন্ত্রী।

মন্ত্রী বললেন,—প্রথমতঃ, ঐ দেখুন, মহারাজ, দূরে বহুদূরে ঐ যে মেঘের কোলে কোলে তুষারাবৃত শৃঙ্গমালার কতকাংশ এখন মেঘমুক্ত হয়েছে, দেখুন। আমার মনে হয় ওটা নন্দাদেবী! মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে রাজমাতার সঙ্গে আমি এসেছিলাম ঐ তীর্থে। দ্বিতীয়তঃ, আরো দেখুন—ঐ দূরে নীচের দিকে চেয়ে দেখুন। শ্বেতবর্ণ বহু-চূড়া-যুক্ত বিশাল বিশাল পুরীর মত কত কী যেন দেখা যাচ্ছে—তাই নয়? খুব সম্ভব ওটা বৃষকেতুর রাজ্য, নন্দাদেবীর পাদমূল থেকে এক যোজনের মধ্যেই ঐ পার্বত্য রাজ্যটি। তবে, আমরা সন্ধ্যার পূর্বে যে ওখানে পৌঁছুতে পারব তার কোন সম্ভাবনা নেই। তবুও আমাদের যেতেই হবে, কারণ আমরা এমনিই ত' অনেকটা দূরে নেমে এসেছি, এখন ফেরা অসম্ভব।

রাজা বিস্ময়ে নির্বাক্, কোন কথা না ব'লে কেবল পথ অতিক্রম ক'রে যেতে লাগলেন মন্ত্রীর সঙ্গে। তাঁর কপালে চিন্তার রেখাগুলি বড়ই গভীর হয়ে ফুটে উঠেছিল।

—পাঁচ—

সন্ধ্যার আর বিলম্ব নেই। এমন সময় একটা বিরাট গাছের কাছে এসে দাঁড়ালেন তাঁরা।—দেখ মন্ত্রী, ওপর দিকে তাকিয়ে দেখ

—একখানা বিমানের মত মনে হচ্ছে না কি ?—উভয়েই দেখলেন ঊর্ধ্ব দিকে তাকিয়ে।—সত্যই ত', বিমানই ত' বটে,—কূর্মাকৃতি বিমান। ওটা যে এইদিকেই আসছে, নয় কি ?

এদিকে রাজকুমার আর সুবল দু'জনে দক্ষিণের পথে নামতে লাগলেন। যৌবনের উন্মাদনা, উৎসাহের দীপ্তি তাঁদের মুখে। আনন্দ আর বিস্ময় যুগপৎ তোলপাড় করছিল তাঁদের অন্তর-ক্ষেত্র। ক্ষিপ্রপদে তাঁরা পা ফেলে চলেছিলেন। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে তাঁরা একটা প্রায়-সমতল ভূমির উপর এসে পড়লেন। সেখান থেকে তাঁরা যে দৃশ্য সামনে দেখলেন তাতে তাঁদের গতি স্তব্ধ হয়ে গেল। তাঁদের সম্মুখে তিনদিকে পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে ঘন সবুজের উপর পীত, লোহিত, পিঙ্গল প্রভৃতি নানা বর্ণের প্রলেপ; বৃক্ষ, লতা, পুষ্প ও বিচিত্র ভেষজে পূর্ণ পার্বত্য বনভূমি যেন আকাশ পর্যন্ত স্পর্শ করেছে। আর সেই পর্বতমালা-বেষ্টিত নীল বর্ণচ্ছটায় উদ্ভাসিত এক বিশাল হ্রদ তাঁদের নয়ন-মনকে বিস্ময়ে ভরিয়ে তুলল। এ-রাজ্যে এত বড় হ্রদ যে থাকতে পারে এ-ধারণা কারও ছিল না। দু'জনেই বিস্ময়ে অবাক্, কারও মুখে কথা নেই।

—ছয়—

কোন অপরূপ দৃশ্য মানুষের চৈতন্যকে কি ভাবে মোহিত করে, কেমন ক'রে অনন্যকর্মা করে দেয় তার মনকে, তাই আজ দেখা গেল এই দু'টি তরুণের মধ্যে। কি হ'ল দু'জনের ? কেউ আর চলেও না, কথাও বলে না,—গতি পর্যন্ত যেন তাদের স্তম্ভিত। অবশেষে সুবল বললেন,—দেখ কুমার! এটা নিশ্চয়ই কোন

দেব অথবা যক্ষ অথবা গন্ধর্ব রাজ্য হবে। দৃশ্যের মধ্যে এমন সম্মোহন শক্তি মানুষের রাজ্যে কোথাও দেখেছ কি? রাজকুমার বললেন,—চারধারের সবুজের মাঝে এমন নীল! কি বিস্তৃত এই নীলের আস্তরণ! এ হ্রদের কতটা বিস্তার হবে, বলতে পার বন্ধু? এতবড় হ্রদ আমি ত' জীবনে কখনও দেখি নি। একবার মাত্র সেদিকে লক্ষ্য ক'রেই আশ্চর্য হয়ে সুবল বললেন,—কুমার, অদূরে ঐ জলের ধারে ধারে কি চমৎকার পদ্ম ফুটে রয়েছে, দেখেছ? এমন অপরূপ নীল পদ্মও ত' আগে কখনও দেখি নি। সাদা আর লাল, এই তু'রকম পদ্মই ত' দেখেছি আমাদের দেশে। কিন্তু অমন নীল—

দেখো, দেখো, সুবল—রাজকুমার হ্রদের ঠিক মাঝখানটার দিকে তর্জনী নির্দেশ ক'রে বললেন,—ঐ যে, একটা নৌকোর মত কি যেন আসছে এদিকে, নয় কি?

তাইত'! দেখো দেখি! ওটাও যে গাঢ় নীল দেখছি! জলের ওপরেই রয়েছে যখন, তখন নৌকোই মনে হচ্ছে বটে। কিন্তু আকৃতিটা যেন অদ্ভুত—তাই না? সুবল নিরীক্ষণ ক'রে দেখতে দেখতে বললেন,—ওটা যাই হোক্, কিন্তু এইদিকেই আসছে ব'লে মনে হচ্ছে!

ক্রমে যেন দূরাগত এক অতি মধুর সুরের ঝঙ্কার এল তাঁদের কানে। কি অপূর্ব সে ঝঙ্কার! কিন্তু তা' কণ্ঠস্বর, কি বীণাযন্ত্রের সুর—ভালমত ধরা গেল না, কারণ দূর হ'তে বায়ু-তরঙ্গের সঙ্গে সুরের রেশ আসছিল ভেসে—কখনও ক্ষীণ, কখনও আবার স্পষ্ট। তবে তু'জনেরই এটা ধারণা হ'ল যে, ঘন নীল জলের উপর ঐ যে অপরূপ বস্তুটি, দূরে হ'লেও তারই মধ্য থেকে সুরের এই তরঙ্গ

উঠছে। ক্রমে তাঁরা আরও দেখতে পেলেন, তরণীটি ময়ূরের আকৃতি-বিশিষ্ট; রংটিও অবিকল ময়ূরের কণ্ঠের মত; আরও নিকটে এলে দেখা গেল, তরণীর সর্ব অঙ্গে ময়ূরের সর্বাঙ্গ চিত্রিত। বাইরে এমন কাকেও দেখা গেল না যাকে কর্ণধার বলা যায়। সুতরাং ঐ তরণী চালকহীন, অথচ তার গতি আছে। সুবল বললেন,—অদ্ভুত! তারপর একটি কোমল কণ্ঠের গান যেন ভেসে এল একবার তাঁদের কানে। পরক্ষণেই বীণার ঝঙ্কার। এই ভাবের সঙ্গীত ক্রমাগত তাঁদের কানে আসতে লাগল।

খানিক পরে দেখা গেল, দাঁড়ি-মাঝিহীন বিচিত্র সেই তরণী ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে তাঁদেরই দিকে। তারপর ক্রমে ক্রমে অস্পষ্টভাবে যেন দেখা গেল যে তার ভেতর নানাবর্ণরঞ্জিত বস্ত্রের অপূর্ব চন্দ্রাতপের তলে এক শুভ্রবর্ণা দেবী-প্রতিমা যেন বীণা-হাতে উপবিষ্টা রয়েছেন। তাঁদের প্রাণের মধ্যে বীণাপাণি সরস্বতীর যে মূর্তি সংস্কারগত, সেই মূর্তিই যেন ক্রমে তাঁরা দেখতে পেলেন—তাঁদের সামনে ঐ তরণীর মধ্যে। ক্রমে দেখা গেল অপরূপ সেই মূর্তির দিব্য অঙ্গুলীগুলি যেন বিজলী-চমকের মতই বীণাতন্ত্রী-সমূহের মধ্যে ঝলসিত হয়ে উঠছে—এই অপূর্ব দৃশ্য তাঁদের স্তম্ভিত ক'রে দিলে। আর এই আহত বীণাতন্ত্রী থেকে যে সুর উঠছে তা' যেন সেখানকার বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে সবকিছুই অপরূপ মাধুর্যে মণ্ডিত ক'রে দিচ্ছে! যেন কোন্ অজ্ঞাত রাজ্যের পানে তাঁদের টেনে নিয়ে যেতে চায় এই মোহন বীণাধ্বনি!

রাজকুমার জিজ্ঞাসা করলেন সুবলকে,—নৌকো কে চালাচ্ছে বল ত'? সুবল বললেন—আমার যা' মনে হচ্ছে, তা' যদি তোমায় বলি, তুমি হয়ত' বিশ্বাস করবে না। সে-কথা শুনে রাজকুমার

...বিচিত্র সেই তরণী এগিয়ে আসছে তাঁদেরই দিকে...(পৃঃ ৭২)

বললেন,—বল বন্ধু! এখনই বল। তুমি যা’ বলবে আমি সবই শুনব আর বিশ্বাসও করব। এই অদ্ভুত দেশে আমি সবকিছুই স্বীকার করতে প্রস্তুত আছি।

সুবল বললেন,—আমি শুনেছি, পুণ্যভূমি হিমালয়ের উচ্চস্তরে—যেখানে কেবল যোগী, মুনি, ঋষি, গন্ধর্বেরাই থাকেন,—সেখানে সুরের ঝঙ্কারেই তরণী গতিশীল হয়। বিস্ময়াহত হয়ে কুমার চেয়ে রইলেন মন্ত্রিপুত্রের দিকে। তারপর, তীরাভিমুখী অদ্ভুত তরণীটির দিকে দৃষ্টি রেখে বললেন,—আমি তোমার কথার প্রত্যেকটি বর্ণই বিশ্বাস করি, বন্ধু। দুই বন্ধুতে তারপর স্থির লক্ষ্যে চেয়ে রইলেন ঐ তরণী-বিহারিণী দেবীমূর্তির দিকে। এখন বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল যে ঐ নৌকা ধীর স্থির গতিতে তীরের দিকে এগিয়ে আসছে। এতক্ষণে মনে হ’ল তরণীমধ্যস্থা সেই দেবীর দৃষ্টিও যেন তাঁদেরই উপর পড়েছে। সুরের ঝঙ্কারও যেন পুলকে স্পন্দিত হয়েই ভেসে আসছে।

—সাত—

দেখতে দেখতে একেবারে তীরস্থ পদ্মবনের মধ্যে ঐ অদ্ভুত তরণী এসে প্রবেশ করল, কয়েকটা পাতা ও ফুল দলিত ক’রে তরণীর সম্মুখভাগ স্পর্শ করল তীর-ভূমির উপলখণ্ড।

রাজকুমার যেন সম্মোহিত হয়ে গেলেন; বিস্ময়ে স্থির নির্বাক্ সুবলের স্কন্ধ অবলম্বন ক’রে দাঁড়িয়ে রইলেন। সুবল যেন তটস্থ; কিছু বলতে গেলেন, এমন সময় বীণার ঝঙ্কারের মত অপরূপ কণ্ঠে দেবী বললেন,—এ রাজ্যে আপনারা অতিথি। অনেক দূর থেকে

আপনাদের দেখে তাই আসছি, আপনাদের পরিচয় জানতে। এই ব'লে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে একবার রাজপুত্র আর একবার সুবলের দিকে তাকালেন।

সুবল কিছু বলবার আগেই রাজকুমার শুধালেন,—দেবি! সামান্য একটা কৌতূহল আমাকে পীড়া দিচ্ছে,—এখন ধৃষ্টতা ক্ষমা ক'রে সেটা আগে নিবৃত্ত করবেন কি? দয়া ক'রে বলবেন কি, এই অপরূপ সুন্দর তরণীর কর্ণধার কে? মৃদু হাসির হিল্লোলে তাঁদের শ্রবণকে মুগ্ধ ক'রে বীণানিন্দিত মধুর কণ্ঠে দেবী বললেন,—আমার এই বীণাই হ'ল কর্ণধার; এই বীণার ঝঙ্কারই নিয়ন্ত্রিত করে এই তরণীর গতি।

রাজকুমার এইবার সুবলের পানে চেয়ে দেখলেন, তারপর অধোবদনে এমন ভাবে নীচের দিকে চেয়ে রইলেন যেন তাঁর প্রশ্ন এখনও শেষ হয় নি। কিন্তু প্রশ্ন করা আর হ'ল না, তরণীতে উপবিষ্টা দেবী আবার তাঁদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। তখন সুবল আনুপূর্বিক সকল কথাই তাঁর গোচর করলেন। শুনে দেবী প্রফুল্ল মুখে সুবলকে সম্বোধন ক'রে বললেন,—ভদ্র! আজ আমাদের বড় শুভদিন, আপনাদের সঙ্গে মিলনের সুযোগ পেয়েছি। আমাদের কল্যাণ নিয়েই আপনারা এসেছেন, অথবা দৈবে কল্যাণ মূর্তিমান্ হয়ে আমাদের ভূমিতে অতিথিরূপে আপনাদের এনেছেন। এখন এই তরণীতে এসে আসন গ্রহণ করুন।

রাজকুমারের ঘন ঘন রোমাঞ্চ ও দীর্ঘশ্বাস হচ্ছিল। তিনি নির্বাক্ রইলেন, কিছুই বলবার শক্তি ছিল না তাঁর। তাই দেখে সুবল বললেন,—সে কি? আমরা আপনার তরণীতে কোথায় যাব? আর কেনই বা যাব, যদি এ প্রশ্ন করি?

আমাদের পুরী পবিত্র করতে যাবেন। তা' ছাড়া এমন স্থানে বিভ্রান্ত অতিথিকে রেখে ফেরা যায় কি? এমন নিরাশ্রয় অবস্থায় আপনারা যাবেন কোথা? আপনাদের পরিত্যাগ ক'রে আমি যদি চ'লে যাই, আপনারা কি করবেন?

সুবল বললেন,—দেবি, আপনি জানেন না—কুমারের পিতা ও আমার পিতা উভয়েই এখনও নিরুদ্দিষ্ট।. উত্তর দিকে পার্বত্য অরণ্য-পথের মধ্যে কোথাও আছেন···

বাধা দিয়ে দেবী বললেন,—ওসব চিন্তা আর আপনাদের নয়, আমাদের; তাঁদের যথোচিত ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কারো কোন আক্ষেপ থাকবে না, আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম। রাজকুমার, আপনারা নিঃসঙ্কোচেই আমার এই তরণীতে আসতে পারেন। যেতে যেতে আমি এমন কিছু শোনাতে পারব, যাতে আপনারা নিঃসন্দেহ হবেন; এখন আসুন, বিলম্বে অন্ধকার হয়ে যাবে, পুরীতে পৌঁছুতে বিলম্ব হবে।

অগত্যা দু'জনে তরণীতে আরোহণ ক'রে, দেবীমূর্তির সম্মুখে প্রশস্ত আসনে উপবেশন করলেন। অমনি বীণাতে মৃদু ঝঙ্কার উঠল, সে ঝঙ্কার দু'জনকেই এক অপূর্ব অনুভূতিতে বিবশ ক'রে তুললে। তরণীখানিও সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে তীরভূমি ছেড়ে গভীর জলে এসে বিপরীত মুখে আবর্তিত হয়ে চলতে সুরু করল। নিঃশব্দে চলতে লাগল সেই অদ্ভুত তরণী, অবাক্ বিস্ময়ে বন্ধু দু'টি পলকহীন মুগ্ধ নেত্রে দেবীর মুখের পানে চেয়ে রইলেন—দ্বিধা লজ্জা সঙ্কোচ হারিয়ে। তাঁদের জীবনে এ-ধরণের অপরূপ অভিজ্ঞতা এই প্রথম। একটু পরে দেবী বলতে আরম্ভ করলেন,—তখনও অবশ্য বীণাপ্রান্তে তাঁর অপরূপ অঙ্গুলী-চালনার সঙ্গে সুরের ঝঙ্কার অবিরাম চলছিল।

—আট—

হিমালয়ের এই অংশে গন্ধর্বরাজ্য, আমার পিতা দীপ্তনীল গন্ধর্বই এই পুণ্যভূমির প্রধান। এই নীল হ্রদের পরপারে নীল নগর,—আমাদের পুরী, দুর্গ, সবই এই পর্বতশীর্ষে অবস্থিত। কিছুদিন পূর্বে অজ্ঞাত কোন এক গান্ধারবাসী যবন অশ্ববিক্রেতা অকস্মাৎ আমাদের নীলপর্বতে এসে পড়েছিলেন—তবে আপনারা যেভাবে এসে পড়েছেন, তিনি সেভাবে আসেন নি। কি ভাবে যে তিনি এসেছিলেন তা আমরাই জানি। অবশ্য তিনি এখানে এসে মাত্র প্রহর খানেক ছিলেন। তা' ব'লে তাঁর সেবার কোন ত্রুটিই এখানে আমরা করিনি। কেননা, যথাসাধ্য অতিথি-সেবাই আমাদের বংশের প্রধান ব্রত। আমাদের বংশের নিয়ম হ'ল এই যে, অতিথি যা চাইবেন তখনই আমাদের তাই দিতে হবে—অতিথিকে অদেয় কিছু আমাদের থাকতে পারবে না। যাজ্ঞা করলে আমরা সকল কিছুই দিয়ে থাকি। প্রার্থীকে কখনও আমরা বিমুখ করি না।

এখন, আমাদের এই গান্ধারদেশীয় যবন অতিথিটি কি জানি কোথা থেকে সন্ধান পেয়েছিলেন যে, আমাদের অপলক নামে একটি অপরূপ দৈব অশ্ব আছে। বিদায় কালে সেইটি তিনি চাইলেন। ঐ অশ্ব ছিল আমাদের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়। তাই আমার পিতা এই অশ্বের পরিবর্তে মহামূল্য অনেক কিছুই তাঁকে দিতে চাইলেন, এমন কি তিনি রাজপুরীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা গন্ধর্বকন্যা আলোপীকেও দিতে চাইলেন। উত্তরে তিনি বড় চতুরের মতই বললেন,—আমরা স্থূলবুদ্ধি মানুষ, গন্ধর্বকন্যা নিয়ে কি করব ? তাঁকেও সুখী করতে পারব না, আর নিজেও সুখী হব না। কারণ আপনার

গন্ধর্বকন্যার অমানুষী রূপলাবণ্য, তাঁর দিব্য কণ্ঠ, আমাদের মানুষ প্রতিবেশী সহ্য করতে পারবে না। এই অপূর্ব বস্তুর অধিকারী যে হবে, হিংসা-দ্বেষের বহ্নি জ্বলতে থাকবে তার চারিদিকে, যা' থেকে তার বাঁচা দায় হবে। রত্নস্বরূপা ঐ কোমলাঙ্গী গন্ধর্বনারী। আমাদের দেশের গুরু-স্থূল-ঘন বায়ুতে, ধূম-ধূলিতে পূর্ণ গৃহস্থালীতে, আমাদের বিষাক্ত শরীরের সংসর্গে তাঁকে কোন প্রকারেই বাঁচান যাবে না। শেষে সবদিক থেকেই মহা অনুশোচনার মধ্য দিয়েই আমায় এ জীবন বহন করতে হবে। ক্ষমা করবেন গন্ধর্বরাজ, ঐ অশ্ব ভিন্ন আমার আর কিছু কাম্য নেই।

আমরা সকলেই বেশ বুঝলাম কোন দৈব কারণেই এ বিপত্তি ঘটেছে। বিপত্তি বলছি এইজন্য যে ঐ অশ্ব কঠিন তপোলব্ধ বস্তু। সেই বিচক্ষণ মানুষটিকে যখন কিছুতেই নিরস্ত করা গেল না, তখন আমার পিতা তাকে অপলক দান করলেন। তাকে চালানোর কৌশলও ব'লে দিলেন।

রাজকুমার জিজ্ঞাসা করলেন,—তাকে চালাবারও কৌশল আছে নাকি কিছু? দেবী বললেন,—আছে বৈকি। প্রথমতঃ ওর পিঠে ওঠবার আগে যেদিকে ওকে চালাতে হবে সেই দিকের কথা ওর কানে কানে ব'লে দিতে হবে; তা'হ'লেই ও ঠিক নিয়ে যাবে। যদি ওর পিঠে চড়বার আগে কিছু বলা না হয়, তা'হ'লে ও বড়ই অসন্তুষ্ট হয়। তখন ও নানাভাবে আরোহীকে ফেলে দেবার চেষ্টা করে; তাতে যদি অক্ষম হয় তা'হ'লে পিঠে নিয়ে যথেচ্ছা চলে যায়। আর দ্বিতীয়তঃ ওর পিঠ থেকে নেমেই ওকে বেঁধে দিতে হয়, না হ'লে ও ঠিক নিজের ইচ্ছামত চলে যায়। আপনাদের কাছে ও যে স্থানে ছিল সেস্থানে পবিত্রতা ছিল, তাই ও আপনাদের নামিয়ে দিয়েই ওর

নিজের জায়গায় চ'লে যেত। এখন আরও বুঝতে পারছি যে, সওদাগরটি তার নিজের কাছেও অপলককে রাখতে পারে নি। খুব সম্ভব যেস্থানে সে ওকে রেখেছিল, সেস্থানটা ওর ভাল লাগে নি। সে ব্যক্তি ম্লেচ্ছজাতীয়,—অপবিত্র তার আচার, অপবিত্র স্থানে তার বাস; সেও ঠিক বুঝেছিল ওকে সে কিছুতেই রাখতে পারবে না। তাই সে ওকে বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিল। সেটা বুদ্ধিমানের কাজই হয়েছিল। তার ফল দেখেই আমরা তা' বুঝতে পারছি।

রাজকুমার বললেন,—আমার পিতা মন্ত্রীমহাশয়ের সঙ্গে উত্তর দিকে গিয়েছেন। কোথায় তাঁরা গেলেন, আপনার কি জানা আছে?

বাধা দিয়ে দেবী বললেন,—সে জন্য চিন্তার কোন কারণ নেই, তাঁরা আজ কোন মতেই গন্ধর্ব রাজ্য পেরিয়ে যেতে পারবেন না। আমি পুরীতে পৌঁছে পিতাকে সকল কথা বললেই তিনি বিমান পাঠিয়ে দেবেন গণদেবকে দিয়ে। যেখানেই তাঁরা থাকুন, ঠিক এসে পৌঁছে যাবেন—আপনাদের উদ্বেগের কোন কারণ নেই। আমার কথার সত্যতা পুরীতে পৌঁছে বুঝতে পারবেন।

—নয়—

নীল হ্রদের উপর দিয়ে তরণী বাতাসে সুরের ঝঙ্কার ছড়িয়ে দ্রুত এবং স্বচ্ছন্দ গতিতে চলছে। আশে-পাশে—সোনালী, রূপালী, উজ্জ্বল তামার মত রংএর কত প্রকার ছোট বড় মাছ, অপরূপ পুচ্ছালঙ্কার চালনায় স্বচ্ছ নীলাভ জলের উপর ভেসে খেলা করছে। ক্রমে ঝঙ্কার যত দ্রুত হয়ে এল, তরণীও ততই দ্রুত গতিতে

চলতে লাগল। অবশেষে, পরপারে পুরীর সোপানের তলে এসে স্থির হ'ল।

একটি পরম রূপবান্ বালক দ্রুত নেমে এসে দেবীকে সম্বোধন ক'রে বললে,—দিদি, আজ আমাদের আরও দু'জন প্রবীণ নর-অতিথি উপরে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। দেবী প্রসন্ন বদনে জিজ্ঞাসা করলেন,—তাঁরা কখন কার সঙ্গে এসেছেন, জানো কি অনু? অনু বললে,—কেন? দম্মন কূর্ম-বিমানের উপর নন্দাদেবীর সভা থেকে আসছিলেন, পথে তাঁদের নীল অরণ্যের মধ্যে দেখে তুলে নিয়ে এসেছেন। বাবা তাঁদের সকল কথাই শুনেছেন, এখন তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। দিদি, আরও শোন, করট গিয়ে অপলককেও নিয়ে এসেছে। কি সুন্দর, কি শুভ দিন আজ! দিদি, কেমন আমাদের অপলক ফিরে এসেছে! সে বড় রোগা আর বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে, দেখবে চলো দিদি। দেবী বললেন,—সংবাদ শুভ, শুনলেন ত'? এখন চলুন, আমরা নামি।

সকলেই দীর্ঘ সোপান-শ্রেণী অতিক্রম ক'রে একটি উদ্যান-ভূমির উপর এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেখান থেকে ধীরে একটি বিরাট দ্বারপথ উদ্‌ঘাটিত হ'ল দেখে, দেবী দু'জন অতিথিসহ সেই অপরূপ গন্ধর্ব বালককে সঙ্গে নিয়ে সেই পথে প্রবেশ করলেন। ভিতরে অন্ধকার নেই, অথচ দীপ-মশাল বা অন্য কোনরূপ আলোকের ব্যবস্থাও নেই। চলতে চলতে তাঁরা এক প্রকাণ্ড চত্বরে এসে পড়লেন। পাশেই অপূর্ব উজ্জ্বলবর্ণ খর্বাকৃতি গাছের সারি, তাতে বিচিত্র বর্ণের মনোহর পুষ্পগুচ্ছ, দুইদিকে বহুদূর পর্যন্ত চলে গিয়েছে —মধ্যে পথ। সেই পথে যেতে যেতে তাঁরা চারিদিকে অপরূপ স্তম্ভ-চন্দ্রাতপ শোভিত এক বিস্তীর্ণ মণ্ডপ দেখতে পেলেন সম্মুখে।

সেখানে যা কিছু দেখা গেল তাতে বিস্ময়ের উপর বিস্ময় বেড়েই চলল। অবশেষে তাঁরা সকলেই মণ্ডপের মধ্যে উপস্থিত হ'লেন। সেইখানে গন্ধর্বপ্রধান দীপ্তনীল, সুবলের পিতা ও রাজকুমারের পিতাকে পাশে নিয়ে ব'সে আছেন। সেই দৃশ্য দেখে একটা মিলন-আনন্দের হাওয়া বয়ে গেল। মণ্ডপ উজ্জ্বল দীপ্ত,—অথচ কোন দীপ নেই। প্রণাম-সম্ভাষণাদির পর দেবী বললেন,—পিতঃ! রাজকুমার ও তাঁর বন্ধু পথশ্রমে বড় ক্লান্ত হয়েছেন, তাঁদের ক্লান্তি—

এই কথা শুনে রাজকুমার কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সুবল তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন,—দেবী সত্য কথাই বলেছেন। তবে, আমরা ক্লান্ত হয়ত' সামান্যই হয়েছিলুম, কিন্তু আপনার তরণীতে উঠে আসন গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের শরীরে এক অপূর্ব নব ভাব, এক আনন্দময় শক্তির স্পন্দন অনুভব করছি। এই পবিত্র স্থানের গুণে আমাদের শরীর এক অদ্ভুত স্পন্দনে উদ্বেল হয়ে উঠেছে,—এখন ক্লান্তি আমাদের কল্পনার বস্তু। আমরা ক্ষুধা-বোধও করিনি আর তৃষ্ণা-বোধও করছি না, বিশ্রামেরও প্রবৃত্তি নেই আমাদের এখন।

এই সকল কথা শুনে মহারাজ বললেন,—সুবলের প্রত্যেক কথাই সত্য। আমরা বয়োবৃদ্ধ। এই দীর্ঘ পথ অতিক্রমে আমাদের ক্লান্তি আসাই স্বাভাবিক ছিল; কিন্তু ক্লান্তি ত' দূরের কথা, আমরা যেন নব বলে বলীয়ান্ হয়ে এক আনন্দময় অপরূপ স্পন্দনের স্বাদ পাচ্ছি। প্রাণ আমাদের এক অনির্বচনীয় আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু এত আনন্দ সত্ত্বেও আমাদের আজই স্বস্থানে ফিরে যেতে হবে। কেননা, যে ভাবে আমরা আজ এই রাজ্যে উপস্থিত হয়েছি, তাতে আমাদের নিজেদের পরিবারবর্গের

মধ্যে এবং আমাদের প্রজাদের ভিতর নিশ্চয়ই এক মহা উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। যাই হোক, গন্ধর্বপ্রধানের মিত্রতায় আমরা অনুগৃহীত। ঐ অশ্বটিই হ'ল এ-ক্ষেত্রে আমাদের মিলন-সেতু। সে অশ্ব অবশ্য এখন থেকে তার প্রকৃত প্রভুর কাছেই থাকবে। আমাদের কোন অধিকারই নেই ঐ দৈব সম্পদটির উপর; লোভে বশীভূত হয়ে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে অধিকার করতে আমরা চাইনা।

এখানে রাজকুমার ও সুবলকে রেখে আমরা এখন স্বস্থানে ফিরে যেতে চাই। গন্ধর্বরাজ, এখন প্রসন্ন হয়ে সেই ব্যবস্থাই করুন।

গন্ধর্বপ্রধান বললেন,—মহারাজের কথা এবং উদ্দেশ্য আমি সম্যক্ অনুধাবন করেছি। কিন্তু অতিথি-সৎকারের নিয়মের এমন অদ্ভুত ব্যতিক্রম এখানে এর আগে আর কখনও হয় নি। তাই আমার অনুরোধ, আপনারা অন্ততঃ একটি রাত্রি এখানে যাপন ক'রে যান।

কিন্তু আমাদের এখানে আনন্দোপভোগের কি কঠিন মূল্য দিতে হবে তা' গন্ধর্বরাজ একটু চিন্তা ক'রে দেখেছেন কি? আমাদের এই আকস্মিক অন্তর্ধানের ব্যাপারে আমার রাজ্যে এতক্ষণে নিশ্চয়ই ভীষণ উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে, রাজ্যময় একটা অনর্থ সৃষ্টির সম্ভাবনায় অন্তরে আমরা অত্যন্ত উদ্বেগ অনুভব করছি।

গন্ধর্বরাজ আর দ্বিরুক্তি না ক'রে দম্মনকে ডেকে বললেন,—

দম্মন, অপলক যেমন ক'রে রাজা ও সচিবকে এখানে এনেছে, ঠিক তেমনি ক'রেই তোমার পুষ্পক এখান থেকে তাঁদের রেখে আসুক তাঁদের স্থানে।

তখন রাজকুমার ও সুবলকে আলিঙ্গন, আশীর্বাদ ও শুভ ইচ্ছায় অভিষিক্ত ক'রে মহারাজ আর সচিব দম্মনের সঙ্গে সেই স্থান ত্যাগ করলেন। গন্ধর্বপ্রধান প্রতিশ্রুতি দিলেন,—রাজকুমার ও সুবল যখনই ইচ্ছা করবেন তখনই ওঁদের স্ব স্ব স্থানে পাঠাবার ব্যবস্থা হবে, তাঁরা যেন এ সম্বন্ধে নিরুদ্বিগ্ন থাকেন। পরক্ষণেই সকলে শুনলেন আকাশ-পথে এক মহা গর্জন উঠে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। সুবল ও রাজকুমারকে দেবী ও অনুর কাছে রেখে গন্ধর্বপ্রধান তাঁর আপন কাজে চলে গেলেন।

সুবল তখন রাজকুমারকে বললেন,—এখন তোমার কি ইচ্ছা? দেবী বললেন,—ওঁর ইচ্ছার কথা নয়, আমার ইচ্ছার কথা বলুন। কেননা, এখন আমার ইচ্ছা ছাড়া এ-রাজ্যে কোন কিছু হওয়া সম্ভব নয়—তবে আপনাদের প্রতি আমাদের কর্তব্যের ক্রুটি হবে না সে-বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। আসুন, এখন আমরা স্থানান্তরে যাই।

—দশ—

পূর্ণ চাঁদের কিরণে চতুর্দিক উদ্ভাসিত। প্রস্ফুটিত কুসুমের অপূর্ব সুগন্ধে দিঙ্‌মণ্ডল স্নিগ্ধ। নীল হ্রদের কূলে উদ্যানের একটি সুন্দর লতা-বেষ্টিত মণ্ডপে উপস্থিত হয়ে উপবেশন করতেই অপূর্ব সঙ্গীতের স্বরলহরী রাজকুমার ও সুবলের কানে সুধা বর্ষণ করতে লাগল। সেই সঙ্গীত-সুধা পান ক'রে তাঁদের শরীর নববলে বলীয়ান্ হয়ে

উঠল। একটি স্নিগ্ধ স্বচ্ছ অমৃতধারা শক্তির আকারে তাঁদের অন্তঃকরণ হ'তে একেবারে অন্নময় শরীর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়ে গেল।

সে-গানে ভাষা নেই, শুধু সুর আছে। সেই সুর বায়ুমণ্ডলে তরঙ্গায়িত হ'য়ে সকলকেই যেন আবেশময় ক'রে তুলল। আবেশে ঐ দু'টি মানবকুমারের বোধ হ'তে লাগল যেন তাঁদের প্রাণ সেই অপূর্ব সুরধারায় স্নান ক'রে স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে। সুরের মধ্যে এই প্রাণের বিস্তার,—এ এক মহান্ অনুভব! জীবনে তাঁরা এই প্রথম এক দিব্য অনুভূতি লাভ করলেন: এ অনুভূতির আর তুলনা নেই। যেন সর্বার্থসিদ্ধির আভাস! এই শুভযোগের ফলে দু'জনেই কৃতকৃতার্থ হয়ে গেলেন।

কতটা কাল তাঁরা এই অমৃতে অভিষিক্ত হয়েছিলেন, সে জ্ঞান তাঁদের ছিল না। এতক্ষণ যেন সুরের সাগরে ভেসে বেড়াচ্ছিলেন তাঁরা, এখন দীপ্ত দিনকর-করস্পর্শে তাঁদের প্রাণে অন্য ভাবের স্পন্দন অনুভূত হতে লাগল। এখন রাজকুমার দেখলেন, তাঁরা পূর্বে যে-স্থানে ছিলেন সেখান থেকে অন্যস্থানে এসে পড়েছেন। বিস্মিত হয়ে তিনি ভাবতে লাগলেন,—কেমন ক'রে সেই নীল হ্রদের তীরে পুষ্পবাটিকার অপরূপ আসন থেকে এখানে তাঁরা এসে পড়েছেন। দেবী সেখানে ছিলেন না। তাই তিনি সুবলকে জিজ্ঞাসা করতে গেলেন। সুবলও অবাক্ বিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। রাজকুমার অবশেষে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন,—তুমি কি কিছু বলতে চাও, বন্ধু? সুবল বললেন,—হ্যাঁ, কুমার। এ-স্থান আমি আর সহ্য করতে পাচ্ছি না। অমৃতে কারো অরুচি নেই সত্য; কিন্তু আমাদের শরীর, প্রাণ, মন, বুদ্ধি অন্য ধাতুতে গড়া। তাই বড় বেশী দিন এখানকার বায়ুমণ্ডল আমরা সহ্য করতে পারি না। রাজকুমার বললেন,—

সুবল, কাল পিতা ও মন্ত্রী মশাই দু'জনেই এখানকার বায়ুমণ্ডল সহ্য করতে পারেন নি। তাই গুরুতর কোন এক কারণের অজুহাত দেখিয়ে তাঁরা চ'লে গেছেন। হয়তো মনে করেছিলেন,—তাঁরা যদিও পারেন নি, তবুও, নবীন যুবক ব'লে, এখানকার এই বায়ুমণ্ডল আমাদের হয়ত' অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল সহ্য হবে। তা'ছাড়া তাঁরা বোধ হয় ভেবেছিলেন যে, ভোগ-বিলাসের কাল আমাদের যথার্থই এসেছে। তাই বোধ হয় এই অপরিচিত-অনুভূতিপূর্ণ সুখের রাজ্যে আমাদের দু'জনকে রেখে দিয়ে তাঁরা কাল চলে গিয়েছেন। কিন্তু, আমাদের মানব-সমাজের ভোগ-বিলাস হ'ল স্থূল, বস্তুতান্ত্রিক আর সূক্ষ্ম-অনুভব-বর্জিত। তাতে কেমন ক'রে এখানকার সুখ আমাদের সহ্য হ'তে পারে, বল ত' বন্ধু। এ-কথাটা কিন্তু বিচক্ষণ হয়েও তাঁরা বুঝতে পারেন নি। এদিকে এ-স্থানের বায়ুমণ্ডল আমাদেরও ত' ক্রমশঃ অসহ্য হয়ে আসছে,—জানিনা আর কতক্ষণ এখানে থাকতে পারব।

সুবল বললেন,—সত্য। কিন্তু একটা কথা—আমাদের দেশ না হয় সমতল-ভূমিতে, আর এটা না হয় পার্বত্য রাজ্য। কিন্তু আমাদের দেশেও ত' পাহাড় পর্বত আছে; তবে তুলনায় হয়ত' কম উঁচু। আরও স্বীকার করি যে, এটা না হয় হিমালয়ের সর্বোচ্চস্তর। কিন্তু, এমন কি বস্তু এখানে থাকতে পারে, যাতে এখানকার বায়ুমণ্ডল আমাদের দীর্ঘকাল সহ্য হচ্ছে না? আমার ত' মনে হয় যে, শুধু বায়ুমণ্ডলই নয়, আরও কিছু এখানে আছে যার জন্যে এই দেব-দুর্লভ সুখের রাজ্যও আমাদের কাছে অসহ্য মনে হচ্ছে। একবার দেবীকে জিজ্ঞাসা করলে হ'ত,—কিন্তু এখন তাঁকে পাই কোথায়?

রাজকুমার বললেন,—আমার মনে হয়, এস্থান দেব-রক্ষিত

ব'লেই ভিন্ন দেশের কেউ এসে এখানে ইচ্ছামত থাকতে পারে না। যাই হোক্, বন্ধু, এ এক আশ্চর্য দেশ। দেখ, কাল থেকে আমরা কিছুই আহার করি নি; কিন্তু সেজন্য শরীর তিলমাত্র নিস্তেজ হয় নি, বরং স্ফূর্তি আছে আমাদের মনে। আশ্চর্য! এটা কি স্থান-মাহাত্ম্য, না অন্য কিছু? কিন্তু, তা' সত্ত্বেও আমাদের পক্ষে এ-স্থান অসহ্য বোধ হচ্ছে কেন,—কেন মনে হচ্ছে কতক্ষণে আমরা এখান থেকে যেতে পারব?

তাঁদের কথা চলছিল, এমন সময় দেবী সেখানে প্রবেশ করলেন—তাঁর স্বভাবসুলভ মৃদু মৃদু হাসিতে স্থানটি উদ্ভাসিত ক'রে। এখন দেবীর মূর্তি ঈষৎ লোহিতাভ। অপূর্ব লাবণ্যপূর্ণ সেই মূর্তির দিকে যেন চাওয়া যায় না। নতমস্তকে অগ্রসর হ'য়ে সুবল জিজ্ঞাসা করলেন,—দেবি, আমরা যে এখন আর এখানকার আকাশ-বাতাস সহ্য করতে পারছি না, অথচ আমাদের মনও কী জানি কেন এ-স্থান ত্যাগ করতে চাইছে না!

দেবী বললেন,—আপনাদের শরীর যে মাটি, জল, বাতাসের মধ্যে জন্মেছে, সেই মাটিতেই তা' ভালো থাকবে—এই ত' স্বাভাবিক। এই স্তরে এসে যে এত দীর্ঘ সময় থাকতে পেরেছেন,

তা' কতকটা আপনাদের সুকৃতির ফলে আর কতকটা আমাদের আকর্ষণ,—আমাদের শুভ, কল্যাণকর ইচ্ছার প্রভাবে। কিন্তু আপনাদের পক্ষে আর দীর্ঘকাল এ-স্থান সহ্য করা ত' সম্ভব নয়। কাজেই যখনই ইচ্ছা হবে বলবেন—আপনাদের স্বদেশে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করা হবে।

রাজকুমার বললেন,—দেবি, যেতে হয়ত' আমাদের হবে। কিন্তু জানবেন, আমরা নিতান্ত অনিচ্ছা সহকারেই যাব,—শুধু আর আমরা এই পুণ্যস্থানের প্রভাব সহ্য করতে পারছি না ব'লেই। কিন্তু ভবিষ্যতে যদি আবার এখানে আসতে ইচ্ছা হয়, তা'হ'লে—

দেবী বললেন,—তা' হয় না, কুমার। যেটুকু সুকৃতি আপনাদের ছিল, তার প্রভাব শেষ হয়ে গেলে আর এক মুহূর্তও এখানে থাকতে পারবেন না আপনারা। কেবল মহাভাগ্যের ফলেই মানুষী শরীর নিয়ে কেউ হয়ত জীবনের কোন এক শুভ মুহূর্তে এখানে আসতে পারে; কিন্তু দীর্ঘকাল এখানে থাকা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়,—

সুবল এবার জিজ্ঞাসা করলেন,—কেন, দেবি, মানুষী শরীর নিয়ে এখানে থাকা যায় না কেন? উত্তরে দেবী বললেন,—মানুষের শরীর, মন ও বুদ্ধি অত্যন্ত স্থূল। সে যেখানেই থাকে, স্বভাব-দোষে সেখানেই সে নরক সৃষ্টি ক'রে বসে,—এ তার স্বভাব-ধর্ম। অবশ্য, পশুরাজ্যের সঙ্গে তুলনা ক'রে মানুষ হয়ত' নিজেকে স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ব'লেই মনে করে, এই শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে মনে মনে হয়ত' গর্বও অনুভব করে। কিন্তু, যে-সব দোষে পশু পশুই, মানুষের মধ্যেও ঠিক সেই সব দোষই আছে, আর আছে যথেষ্ট পরিমাণেই। সেইজন্য

আমরা মানুষকে উচ্চস্তরের পশু ছাড়া অন্যভাবে দেখতে পারি না। পশুরা যেমন হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থপরতা, লোভ ও মাৎসর্যের অধীন, আপন ভোগটাকেই তারা যেমন জীবনের একমাত্র অবলম্বন ব'লে জানে, মানুষও ঠিক সেইরকম। পশুর যেমন, তেমনই মানুষেরও হিংসা ছাড়া ভোজন-স্পৃহা তৃপ্ত হয় না; স্থূল আহার, নিদ্রা আর ইন্দ্রিয়-সেবাই তাদেরও প্রধান ভোগ; ফলে, যেখানেই থাকুক্ না কেন, নরক সৃষ্টি না ক'রে মানুষ পারে না। তা'ছাড়া, তার ঐ ভোগের অপর ফল—রোগ। এখানে সে পশুর তুলনায় হীন। ভোগের লোভে অন্ধ হয়ে সে রোগ সৃষ্টি করে আপন শরীরে, ভোগের লোভ থেকে বাঁচাতে পারে না নিজেকে। আর, ভোগের সঙ্গে মন ও বুদ্ধির বিকারও মানুষের মধ্যে এতই বেশী যে, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করবার ব্যবস্থা ক'রেও সে কখনোই প্রকৃত সুখে বা শান্তিতে বাস করতে পারে না; নিয়তই হিংসা ও বিদ্বেষে জ্ব'লে পু'ড়ে মরতে থাকে। সকল দিক থেকে বিচার করলেই বুঝতে পারবেন, এই পবিত্র স্থানের পক্ষে মানুষ কতটা অকল্যাণকর। সেইজন্য প্রাকৃত নিয়মেই মানুষ এখানে আসতে পারে না, থাকতেও পারে না। যদিবা কখনও প্রকৃতি-জননীর কোন খেয়ালে হঠাৎ কোন মানুষ এখানে এসে পড়ে, তাতে তার লাভই হয়—স্রষ্টার এক মহান্ উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয়। এখানে থাকবার শক্তির অভাবে যখন তাকে স্বস্থানে ফিরে যেতে হয়, তখন এই পুণ্যভূমিতে আসবার মত পুণ্য-সঞ্চয়ে সে যত্নশীল হয়, সৎভাব ও সৎকর্মের ওপর তার আস্থা আসে। সে তখন সংযমের মাহাত্ম্য বুঝতে পারে, উচ্চস্তরে বাস করবার উপযুক্ত হবার জন্য তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়।

সুবল জিজ্ঞাসা করলেন,—মানব-সমাজ থেকে এতটা দূরে

থেকেও মানুষের এই চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের কথা আপনি কি ক'রে জানলেন তাই জানতে ইচ্ছা করে।

দেবী বললেন,—মানুষের প্রতি আমাদের একটা সহজ অনুকম্পা আছে ব'লে। তা'ছাড়া প্রতিটি মানুষের ক্রিয়াকর্ম, স্বভাব, প্রকৃতি, তাদের নিত্যকার কর্মগতি আমরা ইচ্ছামাত্রই দেখতে পাই,—দেখতে পাই যে দুর্গতি তাদের বিষম; আর সেইজন্যই তাদের প্রতি আমাদের একটা সহজ দয়া, শুভ ইচ্ছা রয়েছে। মানবের কল্যাণ হোক্,—আমাদের এই আন্তরিক শুভ ইচ্ছারূপী এক শক্তির স্পন্দন অবিরাম মানব সমাজের কেন্দ্রস্থলে পৌঁছে তাদের মধ্যে ক্রিয়া করছে। প্রাকৃত নিয়মেই মানব-সমাজের মধ্যে যাদের এটা ধারণ করবার বা গ্রহণ করবার শক্তি আছে, আমাদের এই স্পন্দনাত্মক ভাবধারা তারা গ্রহণ ক'রে নিতে পারে। তারাই শ্রেষ্ঠ মানুষ, তাদের ভাব মিশে যায় সমাজ-দেহে। এইভাবেই এই বিশ্বে, এই সৃষ্টির মধ্যে, উচ্চ-নীচ সকল লোকের বা দেশের সঙ্গে সকল ভূমিরই সম্বন্ধ আছে। কেউ নিরপেক্ষ থাকতে পারে না; এই সৃষ্টির সবই এই ভাবসূত্রে গাঁথা।

সুবল বললেন,—দেবি, মানব-সমাজেও ত' উচ্চস্তরের সাধন-সম্পন্ন জ্ঞানী ব্যক্তি আছেন। তাঁরাও ত'—

বাধা দিয়ে দেবী বললেন,—নিশ্চয়ই তাঁরা শ্রেষ্ঠ, মানব-সমাজের তাঁরা প্রাণ। কিন্তু, তা' সত্ত্বেও তাঁরা যতক্ষণ না দেহ-নিরপেক্ষ হয়ে থাকতে পারবেন ততক্ষণ তাঁদের উচ্চস্তরে স্থিতি সম্ভব নয়। শরীর থাকলেই স্থূল আহার চাই; ফলে, নরক সঙ্গে থাকবেই। এখানে আমাদের সকল কিছুই শরীর-নিরপেক্ষ, শরীর অবলম্বন ক'রে আমাদের কোন গুণই ক্রিয়া করে না। আমাদের

শরীর রক্ত-মাংস দিয়ে গড়া নয়, গড়া তেজোময় পদার্থ দিয়ে। সেই জন্য মানুষের ন্যায় স্থূল রসযুক্ত ভোজ্যের প্রয়োজন আমাদের হয় না। এখানকার বায়ু, জল, মাটি সবই সূক্ষ্ম,—স্থূল নয়। সেইজন্যই স্থূল শরীর নিয়ে কোন মানুষ এখানে বেশীক্ষণ থাকতে পারে না। তা'ছাড়া আমাদের কর্মেও প্রভেদ আছে। ইচ্ছা মাত্রই আমাদের কর্ম মূর্তিমান্ হয়; আর, মানুষের প্রত্যেক কর্মই শরীর নিয়ে, শরীরের সঙ্গে মন ও ইন্দ্রিয় মিলিয়ে চেষ্টায় সকল কাজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়—এই প্রভেদ।

রাজকুমার বললেন,—সত্যই, দেবি, বোধ হয় এই কারণেই আমাদের চোখে এখানকার সব কিছুই এমন জ্যোতির্ময় মনে হচ্ছে, সমস্ত গাছ-পালার মধ্যেও আমরা এমন একটা লাবণ্য দেখছি যাতে আশ্চর্য না হয়ে পারছি না। তা'ছাড়া এমন নীল পদ্ম আমরা কখনও দেখিনি বা শুনিনি। এখানকার সব কিছুই আমাদের স্মৃতিতে চির-ভাস্বর হয়ে থাকবে। এই স্মৃতিই যোগাবে আমাদের জীবন-পথের পাথেয়, জীবনে তাই হবে আমাদের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন।

* * * *

নিজ রাজ্যে ফিরে এসে কুমার ও সুবল যখন তাঁদের গুরুজনদের প্রণাম ক'রে দাঁড়ালেন, তখন তাঁদের দেহ যেন একটা দিব্য দ্যুতিতে, এক অপরূপ লাবণ্যে উদ্ভাসিত। এই দ্যুতি, এই লাবণ্য বহুদিন পর্যন্ত দেখা গিয়েছিল তাঁদের দেহে।

একালের কথা

—এক—

মগধের রাজধানী পাটলীপুত্র। তখনকার দিনে ভারতের গৌরব-স্বরূপ, রাজশক্তির বিকিরণ-কেন্দ্র, ধনজনপূর্ণ, সৌভাগ্যসম্পদে অতুলনীয় এই বিশাল মহানগরী শুধু ভারতের নয়, বোধ হয় সমগ্র এসিয়াখণ্ডের এবং ইউরোপের অংশ-বিশেষেরও আকর্ষণের বস্তু ছিল। তখনকার সভ্যজগতের প্রত্যেক সভ্য জাতির সঙ্গে ভারতের মহাগৌরবময়, বিপুল কীর্তিমুখর এই পাটলীপুত্রের বড়ই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য, রাষ্ট্রনীতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিদ্যা-সংস্কৃতি প্রভৃতি সকল দিকেই এই মহানগরীর সহিত সভ্যজগতের ঘনিষ্ঠ আদান-প্রদান চলিত।

গঙ্গা ও শোনভদ্র এই দুই মহানদীর সঙ্গমের অতি নিকটেই তখনকার এই মহানগরী প্রতিষ্ঠিত ছিল। পূতসলিলা গঙ্গার তীরে তীরে রাজধানী প্রায় পাঁচ ক্রোশ বিস্তৃত। এই মহানগরীর চারি দিকেই প্রশস্ত রাজপথ। উত্তর দক্ষিণে প্রশস্ত দীর্ঘ পথকে রাজপথ, আর প্রস্থে পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত পথকে মহাকাল বলিত। গঙ্গাতীর বরাবর এক অতি উচ্চ বাঁধ মহানগরীর শেষ সীমা অতিক্রম করিয়াও

বহুদূর পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। অপর তিনদিক বেষ্টন করিয়া আছে অতি উচ্চ, বিশাল সুদৃঢ় নগর-প্রাচীর। গঙ্গাতীর হইতে মহাকালের মধ্য দিয়া আসিতে দারুময় বিশাল দ্বিতীয় প্রাচীর। উহা এত প্রশস্ত যে উহার উপর দিয়া ছয়জন অশ্বারোহী অনায়াসেই পাশাপাশি যাইতে পারিত। উচ্চেও উহা প্রায় ত্রিশ হাত। উহার উপর হইতে বহুদূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলিত। উহার স্থানে স্থানে স্তম্ভাকৃতি প্রহরাসন—এইরূপ দুইশত উনষাটটি প্রহরী-স্তম্ভ। নগররক্ষকেরা সে-স্থান হইতে চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিত। নগর-প্রাচীর ও দারুময় উচ্চ প্রাচীরের মধ্যে মধ্যে ছোট বড় চৌষট্টিটি দ্বার ছিল। প্রত্যেক দ্বার লৌহকীলক-সংবদ্ধ বিশাল কপাটযুক্ত, ভিতর হইতে বন্ধ করা যাইত। প্রত্যেক দ্বার সতর্ক সৈনিক-প্রহরী-বেষ্টিত, সর্বদা সুরক্ষিত এবং সারাদিন উন্মুক্ত; সন্ধ্যার পর বন্ধ হইত। দ্বিতীয় দ্বার অতিক্রম করিয়া ঘনবসতি, তাহার পরই নগর-প্রাকার—সর্বদা গভীর জলপূর্ণ থাকিত। অল্পদূর ব্যবধানেই এক একটি ঘাঁটি, প্রতি ঘাঁটিতেই এক একটি প্রশস্ত কাষ্ঠ-সেতু। ঐ সেতুগুলি শৃঙ্খলাবদ্ধ, রাত্রে উঠাইয়া পথ বন্ধ করা হইত এবং দিনমানে আবার ফেলিয়া রাখা হইত। এইভাবে বহিঃশত্রু হইতে এই মহানগরী সুরক্ষিত ছিল।

রাজধানীর কেন্দ্রে বিশাল দারুনির্মিত সপ্ততল ইষ্টমন্দির। উহার শিল্প-মাধুর্য তখনকার দিনে অতুলনীয় ছিল। এখন বর্মা-শ্যাম-কাম্বোজাদি পূর্বদেশে প্যাগোডায়, এবং নেপালে যেরূপ দারুময় মন্দির-স্থাপত্য দেখা যায় ইহাও সেইরূপ ছিল। ভাস্কর্যে প্রস্তর ব্যবহারের পূর্বে ভারতের সর্বত্রই দারুময় স্থাপত্যের যথেষ্ট প্রচার ছিল। সূর্যরূপী এই মহাকাল মন্দিরই নগরের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং

স্বয়ং মহারাজ এখানে প্রত্যহ প্রাতে আসিয়া অর্ঘ্য নিবেদন করিতেন।

এই মন্দিরের চতুর্দিকে উদ্যান, মধ্যে একটি বৃহৎ কুণ্ড। নিত্য-পূজার যত জল, গুপ্ত প্রণালীর মধ্য দিয়া সেই কুণ্ডে গিয়া পড়িত। বিশাল পুষ্পোদ্যানে নানা জাতীয় সুগন্ধি পুষ্পের বৃক্ষলতা বহুদূর পর্যন্ত সারিবদ্ধ। প্রত্যেক পথের দুই ধারে মর্মর আসন সন্নিবিষ্ট,—মধ্যক্ষেত্রে নানা ভাবের সুদৃশ্য রচনা। উদ্যান-বেষ্টিত মহা-মন্দিরের চারিদিকে চারিটি সু-উচ্চ তোরণ কারুখচিত দারু-স্তম্ভের উপর অবস্থিত। মহানগরীর প্রধান চারিটি রাজপথের তিনটি মহামন্দিরের তিনটি তোরণ-দ্বারে অর্থাৎ দক্ষিণ, পশ্চিম ও পূর্ব তোরণ-দ্বারে শেষ হইয়াছে; বাকী চতুর্থ বা উত্তর তোরণটি রাজপুরীর মধ্যে যাইবার পথের সঙ্গে মিলিত হইয়া রাজ-প্রাসাদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেই পথে রাজ-পুরাঙ্গনাগণ এবং মহারাজ স্বয়ং পূজার্থে মন্দিরে আসিতেন।

মন্দিরের উত্তর দিকে রাজ-প্রাসাদ। তাহার শোভা ও সৌন্দর্য বর্ণনাতীত। প্রাসাদের পূর্ব ও উত্তর দিকে বিস্তৃত মনোহর উদ্যান, একদিকে দ্বিতীয় দারুময় প্রাচীর পার হইয়া একেবারে গঙ্গার তীর পর্যন্ত তাহার বিস্তার।

—দুই—

রাজপুরীর পশ্চিম প্রান্তে একাংশে বহু সতর্ক প্রহরী-বেষ্টিত কোষাগার এবং তাহার পার্শ্বেই অনুরূপ প্রহরী-সৈনিক-পরিবেষ্টিত অস্ত্রাগার। সেখানে সাধারণের প্রবেশাধিকার নাই। রাজমহলের

সিংহদ্বার পার হইয়া অস্ত্রে-শস্ত্রে সুসজ্জিত প্রহরী সংরক্ষিত বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, তাহার তিন দিকে কক্ষশ্রেণী। রাজ-অনুচরগণ এবং বিশিষ্ট রাজকর্মচারিগণ—সর্বদা যাঁহাদের রাজকার্যের জন্য প্রাসাদে অবস্থানের প্রয়োজন হইত—তাঁহাদের মধ্যে মন্ত্রী, অমাত্য, দৌবারিকগণই প্রধান ;—তাঁহাদের জন্যই ঐ কক্ষগুলি নির্দিষ্ট ছিল। প্রাঙ্গণের উত্তরদিকে সভাগৃহ। এই বিশাল সভাগৃহের ঐশ্বর্য দেখিয়া ভারতের বাহিরের স্বাধীন রাজ্যের রাজদূত এবং প্রতিনিধিগণ বিস্মিত হইতেন। সভাগৃহের প্রশস্ত স্তম্ভগুলি বিচিত্র কারুখচিত দারুময়, উপরে স্বুবর্ণমণ্ডিত এবং প্রত্যেক ব্যবধানে স্বুবর্ণময় ঝালর বিলম্বিত —উজ্জ্বল দিবালোকে ঝলমল করিত। নানা ধাতু এবং রত্নমণ্ডিত বহুমূল্য আসনগুলি সভাগৃহ উজ্জ্বল করিয়া চারিদিকে ঘন প্রতিষ্ঠিত, সভাকালে সেগুলি পূর্ণ থাকিত। এই সকল দেখিলে স্বভাবতই মনে হয়—রাজার এত ঐশ্বর্য কোথা হইতে আসে ?—না জানি কত বৎসর লাগিয়াছে এই সকল যথাযথ নির্মাণ করিতে ? একবার দেখিতে আরম্ভ করিলে, 'আরো দেখিব, আরো দেখিব' এইরূপ একটা উৎসাহ প্রবল হইয়া উঠে ;—ক্লান্তি-বোধ তো হয়ই না। সম্মুখে ও পশ্চাতে আবার সুসজ্জিত কক্ষশ্রেণী-বেষ্টিত অপর একটি প্রাঙ্গণ। একদল বর্মচর্ম-পরিহিত অশ্বারোহী কোষমুক্ত অসি হস্তে রাজাজ্ঞার অপেক্ষায় অষ্টপ্রহর সেইস্থানে প্রস্তুত থাকিত। সেই প্রাঙ্গণ পার হইয়া দ্বাদশপ্রহরী-রক্ষিত একটি বিশাল তোরণ, উহাকে অন্তঃপুর-তোরণ বলা হইত। উহা পার হইয়াই বিস্তৃত-অলিন্দ-বেষ্টিত চত্বর ; তাহার পরেই রাজ-অন্তঃপুরস্থ-প্রাঙ্গণ—তাহার তিনদিকে কক্ষশ্রেণী। সেই সমস্ত কক্ষ অন্তঃপুরের পরিচারিকা, করঙ্কবাহিনী, চামরধারিণী, ধাত্রী প্রভৃতি দাসীগণ এবং মহারাজের শরীর-রক্ষিণী-

গণের দৈনন্দিন কর্মকালীন বাসের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। প্রাঙ্গণের অপর অংশে দ্বিতল ও ত্রিতলের কক্ষশ্রেণী বিশিষ্ট রাজপরিচারকবর্গের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। ঘরগুলির সম্মুখে প্রশস্ত, দীর্ঘ, দারুময় স্তম্ভশ্রেণী-সংযুক্ত অলিন্দ। বিচিত্র শিল্পালঙ্কারে ভূষিত পাষাণময় সোপানশ্রেণী অবলম্বনে সেই অলিন্দ হইতে প্রাঙ্গণমধ্যস্থিত পুষ্পবাটিকায় আসা যাইত। নানাজাতীয় পুষ্পের সুগন্ধে প্রাতে এবং সন্ধ্যায় রাজপুরী আমোদিত থাকিত। তাহার সহিত অগুরু-সুরভিত ধূপবর্তিকার গন্ধ মিলিয়া দেবালয়ের অনুভূতি আনিয়া দিত। পবিত্র গন্ধে চারিদিক পবিত্র হইয়া উঠিত।

—তিন—

বহু সশস্ত্র-প্রহরি-বেষ্টিত রাজ-অন্তঃপুরের পশ্চাতে মনোহব উদ্যান—নদীতীর পর্যন্ত বিস্তৃত। সেই সুরম্য উদ্যানপ্রান্তে অগণিত পুরীরক্ষীর বাসগৃহ। প্রহরিসমূহের গৃহ-সংলগ্ন উচ্চপ্রাচীর। সেই প্রাচীর মধ্যে সহস্রাধিক বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত পুরীরক্ষক সৈনিক রাজপুরীরক্ষার জন্য সর্বদাই বর্তমান থাকিত। নগর-প্রাচীরের বাহিরে, রাজপুরীর উদ্যানের উত্তরপ্রান্তে অশ্বশালা,—তাহাতে রাজপুরীর জন্য দুইশত উৎকৃষ্ট অশ্ব থাকিত। যুদ্ধের জন্য নগর-বাহিরে পৃথক্ অশ্বশালা ছিল।

মহানগরীর উত্তর ভাগে অপর এক অংশে রাজপুরোহিতগণ এবং রাজ্যের প্রধানগণ বাস করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে রাজ-মন্ত্রী, মহামাত্য, রাষ্ট্রিক, প্রাড়্বিবাক এবং মহাবলাধিকৃত প্রভৃতি যাঁহারা রাজপ্রদত্ত গৃহে বাস করিতেন, তাঁহাদের গৃহগুলি সর্বপ্রকারেই সুন্দর

এবং উদ্যানবেষ্টিত। এতদ্ব্যতীত এই অংশের প্রায় সমস্তটাই কেবল ব্রাহ্মণগণের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। তারপর রত্নবণিক্ এবং বিবিধ মণিমুক্তা-রত্নাদি-ব্যবসায়িগণের সুরক্ষিত পল্লী।

রাজধানীর মধ্যে ছোট বড় একশত-বিংশতিটি বাজার; তাহার মধ্যে পশ্চিম অংশে বিস্তৃত বাজারই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ছিল এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ ব্যবসায়িগণের ঘন-সন্নিবিষ্ট কর্মক্ষেত্র,—দিনমানে সর্বক্ষণই জনকোলাহলে পূর্ণ থাকিত। তারপর বহুদূর-বিস্তৃত বস্ত্র-ব্যবসায়িগণের ঐরূপ ঘনসন্নিবিষ্টগৃহশ্রেণী-সংযুক্ত পল্লী। তাহার পর বিবিধ বিশাল-বৃক্ষ-সমাকুল তৃণপূর্ণ ক্ষেত্র, মধ্যে মধ্যে একতল-বিশিষ্ট গৃহসকল-সংস্থিত আতুরাশ্রম। তাহার পার্শ্বে রাজপথের ধারে প্রকাণ্ড উদ্যান-মধ্যে বিস্তৃত চিকিৎসালয়। সেখানে বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল। রাজ-অনুগ্রহে বিস্তর রোগী সেখানে প্রত্যহ চিকিৎসা পাইত, ঔষধ পাইত। গৃহ হইতে দূরস্থিত দুঃস্থ ব্যক্তিগণ আতুরাশ্রমে স্থান এবং পথ্য পাইত। সেখানে উত্তম চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল। দেশী-বিদেশী বিপন্নমাত্রেই সেখানে অবাধ প্রবেশ এবং চিকিৎসা পাইবার অধিকারী ছিল। কিন্তু অতীব বিপন্ন ব্যতীত কোনও বিদেশীয় সেখানে যাইত না। চিকিৎসালয়ের পার্শ্বেই রাজকীয় পশুশালা। সেখানে অনেকটা স্থান রাজকার্যে ব্যবহৃত হস্তী, গো-মহিষ, অশ্ব, অশ্বতর, উষ্ট্রাদির বিশ্রামের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। তাহার পরেই মহারাজের পিল্‌খানা বা হস্তিশালা অবস্থিত। এই হস্তিশালায় প্রায় পঞ্চাশটি হস্তী থাকিত। মহারাজের আরোহণের জন্য পাঁচটি অতি বিপুলকায়বিশিষ্ট বহুমূল্য দন্তী এবং রাজ্যের অপরাপর সম্মানিত রাজকর্মচারিগণের জন্য অনেকগুলি গজ এখানে থাকিত। যুদ্ধোপযোগী হস্তিসকল বহুসংখ্যক রক্ষীর তত্ত্বাবধানে

নগর-প্রাচীরের বাহিরে প্রকাণ্ড হস্তিশালায় থাকিত। সেখানে দুই সহস্রাধিক হস্তী ছিল। অর্দ্ধক্রোশ ব্যাপিয়া পিল্‌খানা এবং হস্তিসমূহের পরিচারকগণের গৃহশ্রেণী।

রাজধানীর পূর্ব অংশে ক্ষত্রিয়-বীরগণের বহুবিস্তৃত ঘনবসতি। সেই অংশে বহুধা-বিভক্ত পল্লী-মধ্যে সাধারণ সেনানী হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বশ্রেণীর যোদ্ধা এবং বেতনভোগী মল্লগণ অবস্থিতি করিতেন। তাহার পর সারথিগণের বাসের এবং তাহাদের রথ অশ্ব প্রভৃতির সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল। তাহার পরে দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে স্থপতি, দারু-ভাস্কর, যন্ত্র-নির্মাতা, কর্মকার, রথ-নির্মাতা, লৌহকার এবং সূত্রধরগণের কর্মশালা। পার্শ্বে কুম্ভকার, চিত্রকর, পটুয়া প্রভৃতি শিল্প-ব্যবসায়িগণের ঘনবিস্তৃত পল্লী। প্রশস্ত রাজপথের অপরদিকে বিবিধ বাদ্যযন্ত্র-নির্মাতা, তন্তুবায়, পুত্তলিকা-নির্মাতা প্রভৃতি শিল্পিগণের স্থান; তাহার পর ক্ষেত্রপাল, তৈলিক প্রভৃতি শ্রমজীবিগণের জন্য স্থান নির্দিষ্ট ছিল। অবশেষে পশ্চিম প্রান্তে মহারাজের অস্ত্রশস্ত্র-নির্মাণকার্যের বিরাট কর্মশালা।

—চার—

দক্ষিণে নট ও নটীগণ, নর্তকীগণ, শূদ্রগণ, লবণব্যবসায়িগণ, মাদকব্যবসায়িগণ ও যাদুকরগণের বাস এবং জুয়ার আড্ডা। তাহার পরে বিদেশীয় বাণিজ্য-ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট শিল্পিগণের এবং বারাঙ্গনা-গণের সমৃদ্ধ পল্লী—তাহার পর চর্মকার-পল্লী এবং বিবিধ চর্মবাদ্য-নির্মাণকারী, গোহার ইত্যাদির বাস। অতঃপর গঙ্গাতীর ধরিয়া প্রায় একক্রোশব্যাপী ধীবর-পল্লী। গঙ্গা-তীরভূমির দুই দিকেই

পুষ্পব্যবসায়ী, শঙ্খবণিক্ এবং কংশবণিক্‌দের কর্মস্থান—সারা নগরের দৈর্ঘ্য জুড়িয়া অবস্থিত ছিল। মহাকালের দুই দিকেই বিবিধ দ্রব্যের পসরা মহামন্দির পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অর্দ্ধশতাধিক তাম্বুল ও গন্ধানুলেপন-ব্যবসায়িগণের বিপণি তাহাদের মধ্যে বিশেষ উজ্জ্বল ও শোভাসজ্জায় শ্রেষ্ঠ ছিল।

তখনকার দিনে এই পাটলীপুত্রের রাজপথে দাঁড়াইলে কিরূপ দৃশ্য সাধারণতঃ চক্ষে পড়িত? যে দৃশ্য দেখা যাইত তাহাতে একজন বিদেশীয় পথিকের প্রাণে ভয়, হর্ষ ও বিস্ময় যুগপৎ ক্রিয়া করিত। সেই বিস্তীর্ণ রাজপথের দুই পার্শ্বেই সারি সারি নানাজাতীয় বিপুলকায় বৃক্ষশ্রেণী, মধ্য দিয়া প্রশস্ত রাজপথ সোজা উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত;—তাহাতে নানাজাতীয় পথিক এবং যান-বাহনের অবিরাম চলাচল। বৃক্ষশ্রেণীর অপর পার্শ্বে পথিকদিগের জন্য হাঁটিয়া যাইবার প্রশস্ত পথ। তাহার পরেই নানাবর্ণে রঞ্জিত, বিচিত্র শিল্পালঙ্কারে ভূষিত ছোট বড় নানা আকারের অট্টালিকা-শ্রেণী। তাহাদের কোনটা দ্বিতল, কোনটি ত্রিতল। উপরে ঢালু খোলার ছাদ। প্রত্যেক গৃহের সম্মুখে উচ্চে নানা বর্ণের পতাকা উড়িতেছে। সেই অট্টালিকা-শ্রেণীর স্থাপত্য তখনকার প্রচলিত বিশিষ্ট শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় দিতেছে। অট্টালিকার প্রথম তলে নানা আকারের দারুস্তম্ভগুলি রাজধানীর নিপুণ সূত্রধরগণের শিল্পকীর্তি। কাঠের উপর তাহাদের এমন সুন্দর বৈচিত্র্যপূর্ণ খোদকারী দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। কত রকমের মূর্তি ও অলঙ্কারে ঐ স্তম্ভগুলিকে তাহারা সাজাইয়াছে। সেদিকে চক্ষু পড়িলেই তাহা আর ফিরানো যায় না, অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতে হয়। ঐ অট্টালিকাগুলির প্রথম তলে দোকান, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলে বাসস্থান। ভিতর দিকে প্রাঙ্গণ; তাহার চারিদিকেই

মাল রাখিবার ঘরগুলি, যাহাকে আমরা গুদাম বলি। রাজপথের দুই দিকেই এই প্রকার গৃহশ্রেণী সারি সারি সমরেখায় বরাবর চলিয়া গিয়াছে,—যেন শেষ নাই। কেন্দ্রস্থ বিশাল ইষ্ট-মন্দিরের নিকটে প্রধান চৌমাথায় পথিকগণকে সামলাইয়া চলিতে হয়, সেইখানেই ভিড় সর্বাপেক্ষা বেশী। কারণ চারিদিক হইতে চারিটি প্রশস্ত রাজপথ আসিয়া মহাকাল-মন্দিরের চারিদিকে বেষ্টিত পরিক্রমার পথের সঙ্গে মিলিয়াছে। কাজেই সেখানে যান-বাহন ও পথিক-গণের যথেষ্ট ঘন যাতায়াত। বৃক্ষশ্রেণীর তলে ছায়ায় বিস্তৃত চৌকির উপর নানাজাতীয় ফুলের বিপণি। মাল্যকারগণ বিচিত্র কৌশলে নানাজাতীয় পুষ্পমালা কদলীপত্রে আচ্ছাদিত করিয়া বায়ু ও আতপ হইতে রক্ষা করিতেছে। কি সুন্দর স্তরে স্তরে সাজাইয়া রাখিয়াছে, দেখিলে চাহিয়া থাকিতে হয়।

—পাঁচ—

প্রধান রাজপথের দুই পার্শ্বে মনোহর অট্টালিকা-শ্রেণী,—তাহাদের স্থাপত্য প্রাচীন, আধুনিকতার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই। ভিত্তি যতটা সম্ভব প্রশস্ত, উপর দিকে ক্রমশঃ প্রস্থে কম হইয়া গিয়াছে;—কিন্তু উহার প্রত্যেক তলে দারুশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন দেখা যাইত। তিব্বতে এখনও ঐ স্থাপত্যই প্রবল। অলঙ্কার-মণ্ডিত স্তম্ভগুলি নানাবর্ণে চিত্রিত; উৎসবের দিনে ঐগুলি পুষ্পমালায় সজ্জিত হইত। নীচের তলে দোকান। প্রত্যেক দোকানখানিই সযত্নসজ্জিত। দ্রব্যসম্ভার নিপুণভাবে তিনদিকে সাজানো, দেখিলে ক্রেতার প্রাণে আনন্দ হয়। মধ্যে ক্রেতার স্থান—বসিবার জন্য বিচিত্র কোমল

আসন বিস্তৃত। তাহার উত্তরে ক্রেতার দিকে মুখ করিয়া পুরু গদির উপর বিচিত্র বস্ত্রে আবৃত অধিকারীর আসন। পার্শ্বে দারুময় পেটিকার প্রান্তে মোটা মোটা কয়েক খণ্ড হিসাবের খাতা লইয়া কর্তাকে সর্বক্ষণই উপবিষ্ট দেখা যাইত।

সুপরিষ্কৃত প্রস্তরময় রাজপথের সকল অংশই জলসিক্ত, ধূলা প্রায়ই নাই। তখনকার নিয়মমত প্রত্যেক দোকানের অধিকারী অথবা গৃহকর্তা প্রত্যহ দুইবার করিয়া প্রাতে এবং সায়াহ্নে নিজ নিজ অধিকৃত স্থানের সম্মুখস্থ রাজপথ জলসিক্ত করিতেন। ইহাই ছিল তখনকার রাজবিধি। ইহাতে সারাদিন পথে ধূলা হইতে পারিত না।

রাজপথের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া পথের পানে চাহিলে কি দেখা যাইত? পথের দুইদিকে নানা বেশে সজ্জিত দেশীয় এবং বিদেশীয় পথিকের যেন স্রোত চলিয়াছে। রাজপথের মধ্য দিয়া নানাবর্ণের বিচিত্র রথসংযুক্ত অশ্বের গতাগতি—গজারূঢ় এবং অশ্বারোহী রাজ-পুরুষের অবাধ যাতায়াতের শব্দে রাজপথ মুখরিত। দিনমানে রথের ঘর্ঘর শব্দ, অশ্বের দড়্‌বড়্‌ খটাখট্, হস্তীর ঘণ্টাধ্বনি অবিরাম শুনা যাইত। কোন কোনও বৃক্ষতলে, দূরে দূরে, অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত নগররক্ষক শান্ত্রিগণকে পথিকসকলের প্রতি সতর্কদৃষ্টি রাখিয়া স্ব স্ব স্থানে অবস্থিত দেখা যাইত। নগরবাসী গৃহস্থ, সৈনিক, বিদ্যার্থী, অধ্যাপক, আচার্য, শিল্পী, মাথায় অথবা স্কন্ধে ভার লইয়া নানাবিধ পণ্যজাতবস্তুবিক্রেতা, পরিচারক এবং দাস-দাসীগণের অবাধ জনস্রোত গন্তব্যের দিকে চলিয়াছে। তাহার মধ্যে বালক-যুবা প্রৌঢ়-বৃদ্ধ নর-নারীর বিচিত্র সমাবেশ। কেহ অলস নহে, সকলের মুখই উৎসাহদীপ্ত, শরীর সুস্থ, চলনে উদ্যমের লক্ষণ জাজ্বল্যমান।

একাশ্ব অথবা অশ্বযুগলসংযুক্ত দ্বিচক্র রথে সাধারণ অথবা অবস্থাপন্ন যাত্রী আরোহিগণ দুই-তিন জনে মিলিয়া উপবিষ্ট—কর্মক্ষেত্রের দিকে তাঁহারা দ্রুতগতিতে চলিয়াছেন। আবার অশ্ব-চতুষ্টয়সংযুক্ত যুদ্ধরথে, সুদৃঢ় অঙ্গে নানাপ্রকার অলঙ্কার পরিহিত, অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত বিশালশরীর রথিগণ রাজাজ্ঞায় কোন বিশেষ কর্মে স্থানান্তরে চলিয়াছেন। একটি রথের ঘর্ঘরশব্দ শেষ না হইতেই অপর একখানির আবির্ভাব। সকল সারথিরই দ্রুত লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিবার চেষ্টা, চঞ্চল অঙ্গভঙ্গী, উদ্যমপরিপূর্ণ ঘর্মাক্ত মুখমণ্ডল দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পথের ধারে ধারে অপূর্ববেশধারী একদল বিদেশীয় কর্মান্বেষী সভয়ে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে চলিয়াছে।

মাঝে মাঝে দেখা যাইতেছে কাঁধে বাঁক লইয়া বাহকগণ বাজারের দিকে চলিয়াছে—বাঁকের দুই দিকে বেতের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঝাঁপা, তাহাতে ফল, আনাজ ও শব্জীর রাশি। কখনও দেখা যাইতেছে সদ্যঃস্নাত, চন্দনচর্চিত, উষ্ণীষে আচ্ছাদিত-মস্তক বিপ্রগণ—কেহ পট্ট-কাষায়-বস্ত্র কেহবা চীনাংশুক-বস্ত্র ও উত্তরীয় পরিধান করিয়া, কেহ পুঁথি-হস্তে কেহবা প্রয়োজনীয় গার্হস্থ্য উপকরণ হস্তে লইয়া—নিজ নিজ স্থানে চলিয়াছেন। গানের সুরে হাতে তাল দিয়া স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে পশ্চাতে বিদ্যার্থিগণ চলিয়াছে। আবার পরক্ষণেই দেখা গেল প্রচুর যুদ্ধোপকরণ লইয়া রথশ্রেণী রাজকীয় অশ্বশালায় চলিয়াছে। আবার তাহার পশ্চাতে পদাতিক-সৈন্য-বেষ্টিত রথে রাজস্ব সংগৃহীত হইয়া কোষাগারের দিকে চলিয়াছে। তাহার পর পণ্যভারপূর্ণ বিচিত্র গো-যানের মধ্যে শকট-চালকের সঙ্গে মহাজন পাশাপাশি বসিয়া সহজ ভাবেই নিজ নিজ

কর্মস্থলে চলিয়াছে। তাহার পশ্চাতে কর্মব্যস্ত পথচারিগণ। এই-ভাবে সারাদিন চলিত তখনকার পাটলীপুত্র-মহানগরীর কর্মব্যস্ত সাধারণ জীবন।

—এক—

এক ব্রাহ্মণ আর এক চামার, একই গ্রামের এই দুই জন ভদ্র-ব্যক্তি এক শুভদিন দেখে বেরিয়ে পড়ল এক শুভ উদ্দেশ্যে। দুজনেই মাল কিনবে। ব্রাহ্মণ কিনবে ধান আর চামার চামড়া খরিদ করবে। ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্য, খুব কম দামে ধান এই সময় কিনে রাখবে, পরে তা বেশী দামে বিক্রী করে লাভ করবে। কাজেই কিছু দিন থেকেই তার মনোভাবটা সত্যই এরূপ ছিল যে, এখন ধানের দর খুব কমে যাক্, খুব সস্তা গণ্ডা হোক্, যাতে তার খরিদ করবার সুবিধা হয়। আর চামারেরও কিছু দিন থেকে ভাবটা এই ছিল যে, এখন মোষ ঘোড়া গোরু বাছুরের মড়ক লাগুক্, চামড়া খুব সস্তা হোক্, যাতে অল্প পয়সায় অনেক মাল কেনা যায়! তারপর সেই চামড়া ঠিকমত পাট করে নিয়ে, তাই থেকে হাপর, থলি, সারা বছর ধরে রাজ্যের নানাপ্রকার বর্ম-চর্মের ফরমাস্—বাদ্যবাজনা প্রস্তুত করে বেশ দামে বিক্রী করে লাভবান হওয়া যাবে। দুজনেই মহাজন, ছোট কারবারী নয়।

যাই হোক দুজনেই মনে ভবিষ্যতের আশা আর কল্যাণের

আকাঙ্ক্ষা নিয়ে চলেছে। প্রায় বারো ক্রোশ পথ তাদের আজ যেতে হবে, তারপর রাত্রের বিশ্রাম। রাত্রিটি গ্রামে কাটিয়ে পরদিন আর ছয় ক্রোশ গেলেই হাটে পৌঁছানো যাবে।

বারো ক্রোশ একদিনে খুব বেশী নয়। তখনকার দিনে লোকেরা খুব হাঁটিয়ে ছিল। পনেরো ষোল ক্রোশ সাধারণ লোকে একদিনে দুবেলায় অনায়াসেই হাঁটত। তার উপর কেউ আঠারো কুশে, কেউ বিশ কুশে এই রকম সব বিশেষ হাঁটিয়েদের নাম ছিল। সকাল থেকে দুপুর অবধি হেঁটে তারা এক জায়গায় পৌঁছে ভোজন ও বিশ্রাম করে আবার হাঁটা আরম্ভ করলে। তারপরে আবার সন্ধ্যার মধ্যেই আশ্রয়টা চাই তো! কেননা, তখনকার দিনে সন্ধ্যার পর ডাকাতের ভয়ে সাধারণত পথিকেরা পথ হাঁটতনা, তার উপর এটাও মনে রাখতে হবে তাদের সঙ্গে অর্থ যথেষ্টই ছিল। যাই হোক্, তারা দুজনে সমস্তদিন হেঁটে বেশ বড় একটি গ্রামে পৌঁছে গেল।

এখন কোথায় থাকা যায়? ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্য, কোন গৃহস্থের অতিথি হয়েই রাতটা কাটাবে,—না হলে যদি চটিতে উঠে রাত্রিবাস করতে হয় তাতে কিছু ব্যয় তো আছেই তা ছাড়া সঙ্গে টাকাকড়ি আছে, বিদেশ, বিভুঁই—কে জানে কি ঘটবে! তখনকার দিনে দস্যুর ভয় খুব বেশীই ছিল, বিশেষতঃ সরাই বা চটি, যে সব স্থানে পথিকেরা আশ্রয় নিয়ে রাত্রি যাপন করত সেখানে ডাকাতদের আনাগোনা বেশী। সেইজন্যে পর্যটকেরা সন্ধ্যার পূর্বেই আশ্রয়ের সন্ধান করে নিত।

ভাগ্যক্রমে তাদের পথের ধারেই এক বৌদ্ধ ব্রাহ্মণের ঘরে আশ্রয় জুটল। বৌদ্ধধর্ম যখন ভারতে প্রবল ছিল, তখন তাদের প্রভাব সকলক্ষেত্রেই প্রবল ছিল, এমন কি ব্রাহ্মণ সমাজেও অনেক

বৌদ্ধনীতি উপদেশ প্রভৃতি গ্রহণ এবং পালন করত অথচ নিজ ধর্মত্যাগ করবার প্রবৃত্তি তাদের ছিল না, তাদেরই তখন বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ বলত—আমাদের এই যে গৃহস্বামী ইনিও ঐ প্রকার উদারমনা বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ ছিলেন, একেবারে খাঁটি সত্যাশ্রিত মানুষ। গৃহস্বামী তাদের অভ্যর্থনা করলেন। তিনি দেখেই বুঝেছিলেন যে এরা আশ্রয় খুঁজছে। তিনি ব্রাহ্মণকে আহ্বান করলেন। তাতে সঙ্গী চর্মকারকেও আহ্বান করা হল, যেহেতু দুজনের ভ্রমণের উদ্দেশ্য একই।

সদরের দাওয়ায় একখানি মাদুর পেতে তিনি বসেছিলেন। সেইখানেই তাদের বসালেন। পা ধোবার জল আনিয়ে দিলেন। তখনকার দেশাচার অনুসারে হাত পা ধোয়ার পর কিছু মিষ্টি মুখ করানো রীতি ছিল। তারপর সামান্য দু'চার কথায় তাদের গন্তব্য স্থানের কথা, তাদের উদ্দেশ্য প্রভৃতি প্রয়োজনীয় কথা জেনে নিলেন। ব্রাহ্মণ যথাসময়ে সন্ধ্যা বন্দনার জন্যে ভিতরে যথাস্থানে গেলে পর গৃহস্বামী চামারের সঙ্গে একটু খোলাখুলি ভাবে কথা আরম্ভ করলেন। তার কি কাজ, কত টাকা আন্দাজ সে এখন চামড়া কিনতে ব্যয় করবে। কোন্ জানোয়ারের চামড়া তার চাই, কি ভাবে তা পাওয়া যায়, তা থেকে কি কি জিনিষ তৈরী হবে, কবে গিয়ে তারা হাটে পৌঁছাবে, কবে ফিরবে,—এই সব জেনে নিলেন।

মোট কথা, তিনি বুঝতে পারলেন যে চামার মনে মনে আজ এ অঞ্চলের যত গোরু-বাছুরের মড়ক কামনা করচে।

—দুই—
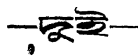
সেকালে সাধারণের মধ্যে রাত্রের খাওয়াটা খুব সকাল সকালই হয়ে যেত। প্রথম প্রহর রাত্রের মধ্যেই কোন গৃহস্থের ঘরেই

খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে বাকী থাকত না। তাই তিনি সন্ধ্যার পরেই রাত্রে যে ঘরে তাদের থাকতে হবে সেই ঘরে নিয়ে গেলেন। সেই ঘরের মেঝেতেই দুখানি আসনে দুজনের জন্য খাবার দেওয়া হয়েছে—একটার থেকে একটু দূরে আর একটা। একজনের জন্য ব্যবস্থা হয়েছে পিঁড়ির উপর গালিচার আসন—ঢাকনা-দেওয়া জলপানের পাত্র, নানাবিধ উপকরণের সঙ্গে পুরি, তরকারী, দধি, দুগ্ধ, কলা—অতি উপাদেয় আয়োজন। অপর ঠাঁই যেখানি, তাতে একখানা তালপাতার চেটাই, বাঁদিকে একটা কাণা-ভাঙ্গা ঘটিতে জল, কাণা-উঁচু একখানা ভাঙ্গা বড় পাথরে মোটা আটার রুটি, সামান্য কিছু উপকরণ, একটা বাটিতে ডাল, আর খানিকটা ভেলিগুড় উপরে এক কোণে রাখা আছে।

ব্রাহ্মণ, দেখবামাত্রই মনে মনে বুঝলে যে, একে বর্ণশ্রেষ্ঠ—তাতে আবার স্বজাতি বলেই তার এই খাতির, আর ও বেটা চামার ওর উপযুক্ত ব্যবস্থাই হয়েছে। আর চামার যখন এই ব্যবস্থা দেখলে তখন আর কিছু না হোক্ এই ভেবে তার একটু দুঃখ হল যে, সত্য বটে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠজাতি, কিন্তু ভদ্রতা ও সৌজন্য বলেতো একটা ব্যবহার সভ্যসমাজে আছে। তা' ছাড়া দুজন অতিথির মধ্যে একজনের প্রতি এতটা বৈষম্য, এতটা স্পষ্ট তারতম্যের হীনতা দেখানো গৃহস্থের পক্ষে অত্যন্ত অশোভন হয়েছে। সে এইরকম ব্যবধানমূলক আয়োজন দেখে মনে মনে কেবল ঐসব কথা তোলপাড় করতে লাগল। একটা আঘাত যে তার প্রাণে লাগবে তা জেনেই যেন গৃহস্থ এ কাজ করেছেন।

এ-কথা অবশ্য মনে রাখতে হবে যে এই চামার, জাতিতে এবং বৃত্তিতে চর্মকার হলেও সমাজের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।

শুধু অবস্থাপন্ন বলে নয় নানাবিধ সৎকর্মের জন্যও গ্রাম্যসভায় তার একটি বিশেষ স্থান ছিল। কাজেই এই তারতম্যে চামারের প্রাণে একটু লেগেছিল।

তার উপর আবার রাত্রে শয্যার ব্যাপারেও সেই তারতম্য দেখা গেল,—চামারের জন্যে একখানা মোটা পুরাতন মাদুরের উপর একখানা কম্বল,—আর উপাধান এক আঁটি পাট তার উপর একটা চট জড়ানো, মশারি না হলে এ-সব স্থানে মানুষের নিদ্রা যাওয়া সম্ভব নয় তাই একটি নোংরা তালি-দেওয়া মশারিও তাকে দেওয়া হয়েছে। আর ব্রাহ্মণের তক্তপোষের উপর দস্তুরমত তোষকাদি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চাদর পাতা, পরিষ্কার মশারি—তার প্রতিই সব শ্রদ্ধা ও যত্নের ব্যবস্থা।

গৃহস্থের কাছে বিদায় নিয়ে, পরদিন ভোরে আমাদের এই অতিথি দুটি যখন যাত্রা করলে তখন গৃহকর্তা বলে দিলেন, যদি এদিক দিয়েই ফেরা ঘটে তা হলে যেন অতি অবশ্য এই ঘরেই পদার্পণ করে গৃহস্থকে ধন্য করা হয়! এই কথা শুনে ব্রাহ্মণ অবশ্য খুসী হয়েই, নিশ্চয়ই আসব আমরা, এই বলে হাসিমুখে অনুমোদন করলে। কিন্তু অপর জন মনে মনে বল্‌লে,—আর কাজ কি দেবতা, আবার তোমার ঘরে, কখনই নয়, এ প্রাণ থাকতে আর নয়।

—তিন—

যাই হোক, তারা সে-দিন দ্বিপ্রহরের অনেকক্ষণ আগেই গন্তব্য স্থানে পৌঁছে গেল। সেই বিস্তৃত, জনপূর্ণ বিশাল বাণিজ্য-ক্ষেত্রে

তাদের পরিচিত কেউ ছিল না। অল্প সময়ের মধ্যেই স্নান আহার আর বিশ্রাম সেরে নিয়ে তারা নিজ নিজ কর্মে লেগে গেল।

দু'জনের যা আকাঙ্ক্ষা ছিল অদৃষ্টক্রমে তা পূর্ণ হল। ব্রাহ্মণ দেখলে ধানের দর সেদিন তার আশানুরূপই সুলভ। একখানি নৌকা ঠিক করে তার সঞ্চিত অর্থে সবই সে ধান খরিদ করে বোঝাই দিতে আরম্ভ করে দিলে। সন্ধ্যা পর্যন্ত সময়টা তার এই কাজেই গেল। সেই রাত্রের জোয়ারে নৌকা রওনা করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে তবে চর্মকারের খবর করলে।

চামারও সমস্তদিন অলস বা অকর্মণ্য ছিল না। তারও আজ অদৃষ্ট প্রসন্ন। সুলভ মূল্যে সে সেদিনকার আমদানি মোষ-গোরু-বাছুর-ছাগল-ভেড়ার যত কাঁচা মাল প্রায় সবই খরিদ করে নৌকা বোঝাই দিয়ে সারা বছরের কাজের ভালমতই ব্যবস্থা করে নিলে। মনে তারও খুব স্ফূর্তি—কোন রকমে এখানে রাতটা কাটিয়ে কাল সকালে আর কিছু কাজ করে একেবারে আহারাদি সেরে যাত্রা করবে, দু'জনের মধ্যে এই কথাই ঠিক রইল।

দু'জনেরই মন আশা ও আকাঙ্ক্ষা-তৃপ্তির একটা গভীর সম্ভাবনায় উত্তেজিত। ব্রাহ্মণ মনে মনে ঠিক করতে লাগল—দুর্মূল্যের বাজারে তার এই ধান ছাড়লে অনেক ধনলাভ হবে। কি চমৎকার হবে তখন, যখন আর দুই মাস পরে বাজার চড়তে আরম্ভ করবে, ধান চালের বাজারে আগুন লাগবে, কি ভালো হবে, হে মা জগদম্বা, তাড়াতাড়ি বাজার যেন চড়ে যায়।

আর চামারের গভীর আনন্দ এই ভেবে যে এক বৎসরের কাজ তার খুব ভাল ভাবেই চলবে। থলি, হাপর, ছালা, তারপর জুতা—নানারকমের চামারি মাল,—ঘোড়ার সাজ, ঢাক ঢোল

বাদ্যাদি, রাজবাড়ীর ফরমাস্ সব মেটানো যাবে। লাভের পরিমাণও তার ভগবানের ইচ্ছায় বেশ বড় রকমই হবে, যেহেতু খুব সস্তায় খরিদ আছে। আর যেন পশু-মড়ক না হয়, দেশে আর একটাও গোরু-বাছুর-মোষ যেন না মরে। তারা বাড়তে থাকুক্, দেশ যেন গোরু-বাছুর মোষে ভরে যায়।

রাতটা কাটিয়ে পরদিন আবশ্যক কাজকর্ম সেরে তারা আহার-বিশ্রামাদির পর তৃতীয় প্রহরে যাত্রা করলে। নৌকা পৌছাবার আগেই তারা নিজ গ্রামে পৌঁছে যাবে। মনে মনে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের নানাপ্রকার কল্পনায় তারা দু'জনেই আনন্দের নেশায় মশগুল্ হয়ে সন্ধ্যার প্রাক্কালে আবার ঠিক সেই গ্রামে গিয়ে উপস্থিত।

—চার—

ব্রাহ্মণ প্রস্তাব করবামাত্রই চামার একেবারে বিরক্ত ভাবেই সেই পূর্ব গৃহস্থের আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণের অতি তীব্র প্রতিবাদ করে বসল। ব্রাহ্মণ কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয়, কারণ আগে তারই লাভ বেশী হয়েছে—সেই ভাল রকম আহারের ব্যবস্থাটা সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না। অনেক জপিয়ে, নানাপ্রকার মিষ্টবাক্যে চামারকে তুষ্ট করতে চেষ্টা করলে—আচ্ছা আর একবার দেখাই যাক্ না, বার বার কি আর ও-রকম হবে? তাছাড়া, ওরা তোমার অবস্থা, তোমার মহিমা কি বুঝবে? সুধু জাতে ছোট হলে কি হয়! তুমি আমার কথা আর একবার শুনে চল, দেখই না কি হয়। আর কিছু না হোক মানুষ তো চেনা যাবে—ইত্যাদি, ইত্যাদি। আসলে চর্মকারের

আর বুঝতে বাকী রইলনা যে ব্রাহ্মণ ভাল খাওয়ার লোভেই আবার সেখানে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ; সে বললে, ঠাকুর মশাইয়ের যখন এতটাই ইচ্ছে তখন আমার আর মান অপমান কি ! আরও না হয় একটু কষ্ট সইতে হবে, তা একটা রাত বই ত নয় ! তাই চল ঠাকুর, আর একবার বামুনের নুন ঝাল খেয়ে আসা যাক্। আবার দুজনে গিয়ে গৃহস্থের সদরে দাওয়ায় উপস্থিত হয়ে তাঁকে সম্ভাষণ করলে।

গৃহস্বামী খুব প্রসন্ন ভাবেই তাদের অভ্যর্থনা করে বসাতে গিয়ে দেখেন যে চামার আগেই নীচে গিয়ে বসেছে। তিনি বললেন, আগে বাবা, হাত মুখ ধোও, তারপর এসে বস এখানে। বলে পা ধোবার জল আনিয়ে দিলেন ;—সে কাজ হলেই চামারের হাতে ধরে একেবারে নিজের পাশে নিয়ে বসিয়ে বেশ শ্রদ্ধাপূর্বক কথা কইতে লেগে গেলেন।

আমাদের ধানের কারবারি ব্রাহ্মণ তাই দেখে মনে মনে বিস্ময়ে যেন কেমন একটু অস্বস্তি ভোগ করতে লাগল। যাক্,—এবার তাদের দু'জনকেই কিন্তু অবাক করে দিলে গৃহস্থের ব্যবহার। সন্ধ্যাহ্নিক করতে ব্রাহ্মণ ভিতরে গেল, তখন আবার গৃহস্বামী চামারের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ ভাবেই কথা আরম্ভ করলেন। কি রকম খরিদ হোল, এতে কতদিন কাজ চলবে। কোন্ কোন্ মাল কি কি কাজে লাগবে ইত্যাদি তার মনের সকল কথা জেনে নিলেন।

তারপর, দু'জন অতিথির কারো বিস্ময়ের মাত্রা তিলমাত্র কম হল না যখন দু'জনে ভোজনের জন্যে আহূত হয়ে সেই ঘরে গিয়ে উপস্থিত হল। তার উপর দু'জনেই স্তম্ভিত হয়ে গেল যখন গৃহস্বামী কোন কথা না বলে চামারের হাতটি ধরে গতবারের সেই ব্রাহ্মণের আসনে বসিয়ে দিলেন। কাজেই ব্রাহ্মণ এবার আর কোন

কথা না বলে সেই পূর্ব ব্যবস্থামত চর্মকারের আসনে বসতে বাধ্য হল।

চামারের কিন্তু মনে তিলমাত্র সুখ নেই, সে ভাব্‌চে—ব্যাপার কি? ভাবতে ভাবতে ভোজন চলতে লাগল। গতবার চামারের পো যা খেয়েছিল এখন ব্রাহ্মণ তাই খাচ্চে, আর ব্রাহ্মণ যা খেয়েছিল তাই পড়েছে চামারের ভাগ্যে। পরমাশ্চর্য ব্যাপার! তারপর যখন শয্যার ব্যবস্থায় এসে দুজনে পৌঁছাল, গৃহস্বামীকে দেখে ব্রাহ্মণ আর ধৈর্য রাখতে পারলে না। হঠাৎ সে বলে ফেললে, —এটা কি রকম হ'ল মশায়?

গৃহস্বামী জিজ্ঞাসা করলেন,—কি ব্যাপার মশায়? ব্রাহ্মণ বললে, এই যে এবারে আমাকে এতটা অপমান করলেন······।

গৃহস্বামী একটু হেসে উত্তর দিলেন,—এটা আপনাদের মনোভাবের উপর লক্ষ্য করেই করা হয়েচে। উভয়ের মনোভাব লক্ষ্য করেই সেবারে ঐ প্রকার সেবার ব্যবস্থা হয়েছিল—আর এখনও আপনাদের বর্তমান মনোভাব লক্ষ্য করেই এই ব্যবস্থা হয়েছে, বুঝে দেখুন না কেন?

তারপর গৃহস্বামী বললেন,—বিষয়টি এই যে, প্রথমে যখন আসেন তখন আপনার এই আকাঙ্ক্ষা প্রবল ছিল যে, এখন দেশে ধান চাল খুব সস্তা হোক্, তা হলে আপনার কেনবার সুবিধা হবে। কেমন, এই ছিল না কি আপনার মনের কথা? এই যে ধান চাল সস্তা হবার আকাঙ্ক্ষা আপনার মনে হয়েছিল, এটা দেশের সাধারণের পক্ষেই কল্যাণকর; সেইজন্যে তখন আপনাকে ঐ ভাবের অভ্যর্থনা করা হয়েছিল। আর এখন আপনার কাজ উদ্ধার হয়ে গিয়েছে, এখন আপনার আকাঙ্ক্ষা এই যে দেশে ধান চালের বাজারে আগুন

লাগুক্, দর এখন খুব বেড়ে যাক্,—সেটা সাধারণের পক্ষে ক্ষতিকর নয় কি ? তাই এখন এই রকম ব্যবস্থা হয়েছে আপনার সম্বন্ধে—এতে আমার কি অপরাধ ? যে ব্যক্তি দেশবাসী সাধারণের ক্ষতির উপর আপনার লাভ বা কল্যাণ কামনা করে, তার সঙ্গে সম্বন্ধটা কি হতে পারে ? আর আমাদের চামারের পো যখন আসেন প্রথমে, তাঁর মনোভাব এই ছিল যে দেশে গোরু-বাছুর-মোষের মড়ক লাগুক্, আমি খুব সস্তায় চামড়া কিনি—সেই একই পর্যায়ে পড়ে আপনার বর্তমান মনোবৃত্তি। সেইজন্যই তাকে তখন সেই রকম অভ্যর্থনা করা হয়েছিল ; আর এখন তাঁর কেনা হয়ে গেছে, এখন তাঁর মনের ভাব এই যে দেশে যেন আর একটিও গোরু-বাছুর না মরে, এখন খুব বাড়তে থাকুক। তাঁর বর্ত্তমান ভাবটি দেশের পক্ষে কল্যাণকর তাই এই সৎ মনোভাবের জন্যে তাঁর এই প্রকার অভ্যর্থনা।

—এক—

সংগ্রামপুর গ্রাম—ডায়মণ্ডহারবার মহকুমায়, আবার হাজিপুরেও বলে। সেই গ্রামে ছিল যতি নামে এক ব্রাহ্মণের ছেলে। ব্রাহ্মণের কথা এল এই জন্য যে শোনা যায় নাকি ব্রাহ্মণেরা ভিখারির জাতি—কথায় বলে লক্ষ টাকায় বামুন ভিখারী। এই যে ছেলেটির কথা বলছি এরা অবশ্য সে রকম নয়—যথার্থই দরিদ্র যাকে বলে এরা তাই। বাপ নেই তার এই ১৩।১৪ বছর বয়সে। বাপ না থাকা যে কি ভয়ানক তা কথায় বোঝানোই মুস্কিল। একটি ছোট্ট বোন, আর মা—এই নিয়ে তাদের সংসার। ভিক্ষাও রোজ রোজ মেলে না,—কে তাদের রোজ ভিক্ষা দেবে? তার পড়াশুনা করবার ইচ্ছাও কম ছিল না কিন্তু শেষে তা' সম্ভব হ'ল না। পাঠশালা বা স্কুলে এতদিন সে বিনা মাইনেতেই পড়ে এসেছে, কিন্তু এখন জমিদার বাবুদের কোপ-নজরে পড়ে তাও গেল।

এত গরীবের উপর জমিদারের কোপ-নজর কেন যে পড়ল তা সে বুঝতে পারলে না; কিন্তু যারা বুঝল তারাও সাহায্য বলে কিছুই করতে পারলে না। বাপ মারা যেতে তার মা গ্রামের

জমিদারদের বাড়িতে রান্নার কাজ করত। তাতে মা, ছোট বোনটি আর তার খাওয়া চলত। পাঁচ-ছয় মাস এইভাবে চলেছিল—যথার্থ দুঃখটা তখনও আসেনি কারণ খাওয়ার দুঃখটা তখনও ছিলনা। আর তার পড়াশুনাও বন্ধ হয়নি। তারা তখন নিজেদের কুটিরেই থাকত।

কিন্তু কি যে হল একদিন—তার মা কাঁদতে কাঁদতে ঘরে এলেন, নিজেও খেলেন না, তাদেরও আর জমিদার-বাড়িতে খেতে যেতে দিলেন না; বললেন,—ওবাড়ি থেকে আমাদের অন্ন উঠেচে যতি, আর আমরা ও পাতকের অন্ন খাবনা—তার চেয়ে বরং ভিক্ষা করে খাব, মুড়ি ভাজব। তোর আর বোধ হয় বেশী দিন পড়াও চলবে না। যতি কাতর হয়ে জিজ্ঞাসা করলে,—কেন মা?

তার মা কি বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় জমিদার বাবুদের বাড়ির জয়মণি বামনী এসে উপস্থিত হল। সেও ঐ বাড়ির একজন রাঁধুনী। এসেই বললে,—কেন রে যতির মা, তুই ওমনি করে গিন্নিকে অপমান করে চলে এলি? ওদের অন্ন বন্ধ হলে খাবি কি? বাচ্চা দুটোকে খাওয়াবিই বা কি? তোর এই পোড়া কপাল নিয়ে এত তেজ কি সাজে?

মা বললেন,—তেজ কেন পিসিমা,—সব কথা জেনে শুনেও তুমি এমন করে আমায় অপমান করচ, একটু মুখে আটকাচ্চে না? গরীব বলে কি আমাদের ধর্ম নেই, না আমরা—

মায়ের গলা ধরে এল, ঝর ঝর করে চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। কাপড়ে মুখ ঢেকে মা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। বামনীর কিন্তু একটুও সহানুভূতি দেখা গেল না।

সে রাত্রিটা তাদের মুড়ি খেয়ে কাটল। পরদিন তাদের মা, খুব

ভোরে উঠে একটা পুঁটলীতে কাপড় চোপড় যা ছিল নিয়ে তাদের দু'জনকে সঙ্গে করে বেরিয়ে পড়লেন। তখনো ভাল ফরসা হয় নি। জ্যৈষ্ঠ মাস, শেষ রাত্রে বেশ চাঁদের আলো ছিল। যতি জিজ্ঞাসা করলে,—মা, কোথায় যাব আমরা? মা শুধু বললেন,—মামার বাড়ি। মায়ের মুখের ভাব দেখে তার আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস হল না। তারা বড় সুখী হল না মামার বাড়ির কথা শুনে।

—দুই—

তাদের মামার বাড়ি বোড়াল গ্রামে। সেখানে যেতে গেলে রেলে করে যেতে হয়। গড়িয়া স্টেশনে নেমে খানিকটা হেঁটে গেলেই হয়। তারা স্টেশনে এসে যখন পৌঁছাল তখন সূর্যোদয় হয়েছে। যাই হোক তারা সংগ্রামপুর থেকে রেলে উঠে বেলা দশটা নাগাত এসে গড়িয়া স্টেশনে নামল। তারপর আবার প্রায় একঘণ্টা হেঁটে তারা মামার বাড়ি পৌঁছাল। দিদিমা ও মামারা তাদের দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তাঁদেরও অবস্থা ভাল নয়। আবার তিনজন উপরি লোক এসে ঘাড়ে পড়াতে তাঁদের মনটা যে খুসী হয় নি তা বুঝতে যতির কষ্ট হল না। ব্যাপার দেখে যতির মনে হল এখান থেকে পালাতে পারলেই যেন সে বাঁচে।

এখন কোথায় তাদের রাতে থাকবার জায়গা দেবে এই নিয়ে গোলমাল বেধে গেল মামাদের মধ্যে। বড় আর সেজ এই দুই মামা ছিলেন বাড়িতে। বড় মামা কোন কথা বললেন না, সেজ একাই কঠিন কঠিন কথা শুনিয়ে তাঁর বোনের এখানে আসাটা আহাম্মকি হয়েছে তাই জানিয়ে আকাশ-ফাটা চীৎকার করতে লাগলেন।

সেদিন যতিদের অন্ন জুটল বেলা তিন প্রহরের পর। কিন্তু ক্ষুধার জ্বালায় ছট্‌ফট্ করলেও যতির মুখ থেকে একটি কথাও বেরুল না।

খড়ের চাল দেওয়া তিনখানি ঘরে তিন মামা থাকেন ছেলে পুলে নিয়ে। ভাঁড়ার ঘরে থাকেন তার দিদিমা, সেটাও ছোট্ট ঘর। এখন রান্নাঘরের মধ্যে তাদের রাত্রে কোন রকমে থাকবার ব্যবস্থা হল।

যতি বাইরে বেরিয়ে একবার ভাল করে চারদিক দেখে নিলে। দেখলে খুব ছোট্ট জায়গার মধ্যেই তাদের মামাদের ঘর ক'খানি। পাশেই একটা পানা পুকুর, তার জল পচা, কলমির দাম আর ঘন পানায় সবুজ হয়ে আছে। তার পাড়ে একটা জাম গাছ। তারপর ছিটে বেড়া দেওয়া একটু জায়গা—হাত চার পাঁচ হবে—তার মধ্যে লাউ-কুমড়ার গাছ আর দু'চারটে লঙ্কা গাছ দেওয়া।

যতির ভাগ্যক্রমে মামাদের অন্নভোগ তিন দিনের বেশী করতে হয় নি। এখানে পদার্পণ করা থেকেই তার ভিতরটা যেন কেঁদে কেঁদে উঠছিল। কেন যে এতটা উতলা হয়ে পড়ল তার মন—সে কিছুতেই বুঝতে পারলে না। এই তার মামার বাড়ি—হা ভগবান!—সে ভাবছিল, মা কেন এখানে এল।

—তিন—

তিন দিনে তিন মামার পরিচয় সে খুব ভালমতোই পেয়েছিল। যতির উপরেই মামা তিনটি যেন খাপ্পা হয়ে উঠলেন। একে অতবড় ছেলে, তার উপর তার লেখাপড়া আছে,—স্কুলের মাইনে, জলখাবার, বই, কাপড়-চোপড় এই সব দিয়ে তাঁরা কেমন করে ঐ অপদার্থটাকে পুষবেন? একে ত' যতির বাপ মারা গেছে, তার উপর তার এই

অসহায় অবস্থা তাঁদের যত রাগ সব যেন উপ্‌ছে পড়ল ঐ যতিরই উপর। ঐ হতভাগাটা যদি বড় হত তাহ'লে তার মা-বোনকে ত' সে নিজেই এখন পুষতে পারত।

বড় মামা বেশী কথার মানুষ নন,—তাঁর অসুখী ভাবটা কথায় কিছু মাত্র প্রকাশ পেল না—কিন্তু আড়ে আড়ে এমন ভাবে তিনি চাইতেন যে তাতেই যতির ইচ্ছা হত যে এখান থেকে পালিয়ে যায়। মেজমামার টিকির নাগাল পাওয়া যেত না। এই তিন দিনে একবার মাত্র তাঁকে যতি দেখেছিল। সেজমামা দেখতেও যেমন ব্যবহারেও তেমন। যেন একটা ডাকাত—লাল টক্‌টকে গোল গোল চোখ, মুখখানা যেন খিঁচিয়েই রয়েচে। প্রথম দিনেই বিকেলে ভাত খাওয়ার পর হল কি, না, যতি একটু বাইরে জামতলার দিকে বেড়াচ্ছিল, এমন সময় "এই, ওখানে তুই কি কচ্চিস," বলে সেজমামা যতিকে এমন বিষম প্রহার করলেন যে যতি আর দম ফেলতে পারে না।

"ওমা, দাদা করচ কি, ওকে মেরে ফেলবে নাকি ?"—বলে যতির মা বেরিয়ে না এলে বোধ হয় সত্যিই সেই মার খাওয়াতেই তার শেষ হয়ে যেত। সারা রাত তার জ্ঞান ছিল না। সকালে একটু সুস্থ হল বটে, কিন্তু গায়ের বেদনায় তার আর নড়বার শক্তি ছিল না।

জীবনে সে কখনো কারো কাছে মার খায় নি। এই ভাবে শুয়ে থাকতে থাকতে মনে মনে সে স্থির করে ফেললে যে, যেমন করেই হোক গায়ের ব্যথা কমলেই সে এখান থেকে ঠিক পালাবে। কষ্ট তার সবচেয়ে বেশী হল মায়ের কথা ভেবে। তারই জন্যে মা এত বেদনা পেয়েছেন প্রাণে।

ছুদিন বেদনাটা খুব বেশী ছিল। চারদিনের দিন ভোরে উঠে সে পালাল। সে শুনেছিল, কলকাতা খুব কাছেই। গোড়ে থেকে মাত্র সাত আট মাইল। পালাবার আগে সে কেবল এক আনা পয়সা মায়ের কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিল। তারপর, এ-কে ও-কে কলকাতার পথ জিজ্ঞাসা করে নিয়ে ঠিক সেই পথ ধরে সে চলতে লাগল।

বাঁশধূনীর পোল বা খেয়া পেরিয়ে সে রসার মাঠে পড়ল। অনেকটা এসে ছু'ধারে বাগান আর ভাঙ্গা পাঁচিল-ওয়ালা ছুই একখানা বাড়ি, একটা পুরাণো বাগানবাড়ি যার থাম পড়ছে ভেঙ্গে, ছাদ যাচ্ছে ধ্বসে—যেন সেকালের কোনো নীলকুটির ধ্বংসাবশেষ —এই রকম কয়েকটা তার চোখে পড়ল। আরও খানিক এসে সে দেখলে বাজরায় লিচু, জামরুল, কাঁচা আম ভরে মাথায় নিয়ে বাগানের জমাদার ফড়েরা বেরিয়ে আসছে। কি মনে করে সে একটা বাগানে ঢুকল। তখন সে প্রায় ক্রোশ দেড়েক এসেছে।

—চার—

একজন ফড়ে একটা ছোট বাজরা বোঝাই জামরুল নিয়ে মাথায় তোলবার জোগাড় করছে। যতি তাকে জিজ্ঞাসা করলে,—একি

বিক্রি করবে এখানে ? সে বললে,—তুমি খাবে ? নাওনা গোটা কতক,—এখানে আমি বেচব না। যতি বললে,—আমি কিনতে চাই। ফড়ে তাকে মালির ঘর দেখিয়ে বললে,—কিনবে যদি তবে মালির কাছে যাও।

মালির কাছে গিয়ে যতি অনেকক্ষণ কথা কইলে। মালি তার অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করতে সে প্রথমেই বললে,—আমার কেউ নেই এ সংসারে। শেষে বললে,—আমি কিছু রোজগার না করলে খেতে পাব না। মালি উড়িয়া, নাম দাশরথি, যতির সুকুমার মুখখানি দেখে তার দয়া হল। তার একটা স্নেহ, সন্তানের মত মমতা পড়ল যতির উপর। বললে,—তুমি ওদিকে যেওনা, ওসব গাছ জমা দেওয়া। এই গাছে উঠে একটা থলে কিম্বা কোঁচড় ভরে পেড়ে নাও।

তার কথা শুনে, প্রথমে যতি কোমরে মাল-কোঁচা মেরে কাপড় বাগিয়ে পরে নিলে, তারপর একটা ছোট থলে নিয়ে গাছে উঠল। প্রায় ছয় কুড়ি বেশ বড় বড় জামরুল থলেতে নিয়ে সে নামল। মালিকে বললে,—এই দেখ ! এর দাম কত ? মালি বললে আরও গোটাকতক নাও, আর আমায় চারটে পয়সা দাও। প্রায় আট কুড়ি জামরুল নিয়ে মালির পাওনা ঐ চার পয়সা মিটিয়ে সে যখন সেখান থেকে যাবার জন্য প্রস্তুত হল তখন মালি তাকে বলে দিলে,—এখনও বেশী জামরুল আমদানি হয় নি বাজারে,—পয়সায় ছটা থেকে আটটার বেশী দেবে না। লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেচলে আরও বেশী দামে বিক্রি হবে, কিন্তু তুমি তা কোরো না। এখান থেকে চলে যাও বরাবর সোজা টালিগঞ্জ,—সানগর হয়ে ; সেখান থেকে কালীঘাট যাও। সেখানে বাজারের আশপাশে এমন একটা জায়গা

দেখে বসবে যেখানে বাজারে ঢোকবার আর বেরোবার সময় লোকের নজর পড়ে। বাজারের ভিতর ঢুকো না যেন, তাহলে দান দিতে হবে। আর ঐ যে ঝুড়িটা ঝুলছে ওটা নিয়ে যাও, ফিরে এখানেই এসো আমার কাছে।

ওখান থেকে প্রায় ত্বক্রোশ হেঁটে যতি যখন উদ্দিষ্ট স্থানে পৌছল তখন প্রায় আটটা বেজেছে। বেলা. দশটার মধ্যে তার সব ফলগুলি বিক্রি হয়ে গেল। কেবল চারটে পড়ে রইল। পয়সা গুণে দেখলে, পাঁচ আনা তিন পয়সা। তার আজ ভারি আনন্দ— পাঁচ আনা তিন পয়সা তার পুঁজি। সেই চারটে জামরুল খেতে খেতে সে চলতে আরম্ভ করলে। একটার সময় সে মালির দাওয়ায় গিয়ে ঝুড়ি রাখলে।

দাশরথি মালির কাছেই যতি রয়ে গেল। তার স্নেহ পেয়ে সেও ধন্য হয়েছিল। দ্বিতীয় দিনে সে আরও কিছু বেশী ফল নিয়ে গেল— মোট দশ পয়সার মাল। পয়সায় চারটে করে কাঁচা আম নিয়ে গেল ঐ সঙ্গে—পয়সা পয়সা কিংবা ত্ব'পয়সায় তিনটে করে সেই মাল বিক্রি হবে।

এগারোটার মধ্যে তার মাল বেচা শেষ করে সাড়ে ন' আনা পয়সা নিয়ে সে এল। আজ অর্থাৎ দ্বিতীয় দিনে তার পুঁজি দাঁড়াল তেরো আনা এক পয়সা। এই ভাবে ভগবান তার প্রতি সদয় হলেন। এই পনেরো বছর বয়সে পয়সা রোজগারের যে পথ সে দেখতে পেলে তাইতেই সে কায়মনোবাক্যে লেগে গেল। সে বুঝেছিল যে, এ-সংসারে পয়সাই সকলকার চেয়ে বেশী দরকারী আর পয়সাতেই সকল ত্বঃখ দূর হয়।

জামরুল আর কাঁচা আম বারো তেরো দিনেই শেষ হয়ে গেল,

ক্রমে জামরুল কমিয়ে কাঁচা আমই সে বেশী করে নিয়ে যেত। তারপর কাঁচা আম শেষ হলে পাকা আম মুটের মাথায় দিয়ে নিয়ে যেত। ক্রমে সেই ঋতুতে যতি সাতান্ন টাকা পুঁজি করে ফেল্‌লে—দু'বেলার খাওয়া রোজ চার আনার বেশী হত না। মুটেদের পাওনা ছাড়া চারটি করে আম আর এক আনা করে বেশী পুরস্কার দেওয়ার ফলে তারা যতির বাধ্য হয়ে পড়ল।

ইতিমধ্যে যতি মাকে ভোলেনি। মামার বাড়ির এত কাছে থেকেও সে আর সেখানে যায়ও নি; তবে সে কোনো ঠিকানা না দিয়ে এমন ভাবে মায়ের কাছে একখানা করে পত্র প্রতি মাসে লিখত যাতে তাঁরা কেউই কিছুতেই তার যথার্থ ঠিকানা না পান। পাঁচ মাস পর থেকে সে মায়ের নামে পাঁচটি করে টাকা পাঠাতে লাগল। এই ভাবে সে দাশরথির কাছে থেকে তার উপদেশমত চলত। বছরের সকল ঋতুতেই ভাল ভাল ফল-পাকড় বেশী পরিমাণে কেনাবেচা করে সব খরচ-খরচা বাদ দিয়ে এক বৎসরেই সে দেড়শো টাকার উপর পুঁজি করে ফেললে।

এখন তিন বৎসর পরের কথা বলছি।

—পাঁচ—

এখন জগন্নাথ ঘাটের কাছে যতি এক জায়গায় একটা বড় ঘরে গুদাম আর অফিস করেছে। অবিরাম তার নিজের পরিশ্রম ত' চলছেই, তা' ছাড়া এখন তার দু'জন সরকার বা গোমস্তা রাখতে হয়েছে। একজন দশ, অপর জন পনেরো টাকা মাইনে পায়। সে দুটি কাজে হাত দিয়েছে। সে দেখেছে যে ফল-পাকড় পোস্তার

বাজারেই বেশী দামে বিক্রি হয়। তাই সে ঐ অঞ্চলে অনেক রকম ফল-পাকড় নানাদিক থেকে এনে গুদাম-জাত করে। সময়ের সব ভাল ভাল ফলই সে আনায়। আরও একটা কাজ সে ধীরে ধীরে আরম্ভ করেছে—সেটা হল পাট।

একজন যথার্থ বন্ধু সে পেয়েছে এ কাজে—সে খুব ভাল পাট চেনে। ক্রমে সে যতিকে পাট চিনিয়ে দিলে। কোন্ পাটের কেমন চেহারা, কোথায় কোথায় পাটের মোকাম, কেমন তার দাম—এই সব তাকে শিখতে হয়েছে। পরে এই কাজেই সে লক্ষ্মীকে পেয়েছিল। পাটের কাজে হাত দেবার পর গত দুই বৎসরে যতির মাসিক সাড়ে তিনশো থেকে চারশো টাকা আয় দাঁড়িয়েছে।

ইতিমধ্যে সে তার মামার বাড়ি থেকে মাকে নিয়ে এসেছে—একখানা বাড়ি ভাড়া করে পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলে সে এখন আছে। তার অল্পই বয়স, এখনও পূর্ণ বিশ বৎসরও হয় নি। এই বয়সে সে তার ভগ্নী রমার বিয়েও দিয়েছে। রমার বয়স হয়েছিল পনেরো,—মায়ের আগ্রহেই একটি গ্র্যাজুয়েট, ওভারশিয়ার, শিবপুর থেকে পাশ করা, মনোমত ভাল পাত্রের সঙ্গে গত বৎসরে তার বিবাহের যোগাযোগ ঘটে গেল। কলিকাতা করপোরেশনে পাত্রের কাজও একটা হয়েছে, দেড়শো টাকা মাইনে। যতির মা এখন সুখী।

পড়ার ঝোঁক যতির বরাবরই ছিল। সেদিকেও সে অবহেলা করে নি। ইতিমধ্যে প্রাইভেট্ টিউটার রেখে সে প্রথম থেকেই স্কুলের স্ট্যাণ্ডার্ড ধরে পড়া আরম্ভ করেছিল। তারপর সে এন্‌ট্রেন্‌স্ পাশও করতে পারলে, তৃতীয় বৎসরে ইণ্টার দিলে, পাশও করলে। পড়াশুনো সে ছাড়ে নি, নিয়মিত দু'ঘণ্টা প্রত্যহ ইংরাজী পড়ে, এবং সাহিত্যচর্চা করে—তার এতে অতুল আনন্দ।

এই ভাবে নিত্য তার ইংরাজী, বাংলা ও অন্যান্য পাঠ চলত। ইংরাজী সে একজন ভাল প্রোফেসারের কাছে পড়ত। এখন সে শিক্ষিত হতে চলেছে, তার বড় বড় তিনটি আলমারি ভর্তি বই হয়েছে। বি. এ. পাশ না করে সে ছাড়বে না—মনে মনে এই তার প্রতিজ্ঞা।

মায়ের আর একটি সাধ—তাদের গ্রামের পৈতৃক ভিটা উদ্ধার করা। সে আশাও পূর্ণ হতে বেশী দেরী হল না। দুই বৎসরের মধ্যেই যতি পাটের কাজে সাঁইত্রিশ হাজার টাকা লাভ করলে। তখন তার সেই ইচ্ছাও সফল হল।

সে এক অপূর্ব ব্যাপার। একদিন ব্যবসায়-সংক্রান্ত কি একটা কাজে সে আলিপুরের কাছারিতে গিয়েছিল। তার উকিল তাকে জিজ্ঞাসা করলে,—জমিদারী কিনবেন?

যতি বললে,—সেকি! আমরা গরীব লোক, জমিদারী নিয়ে কি করব?

উকিল বললে,—আপনাকে জমিদারী নিয়ে কিছুই করতে হবে না, শুধু নিলামে উঠলে পর ডেকে রাখবেন। শুনে যতি বললে, —তারপর?

উকিল বললে,—তারপর যার জমিদারী সেই আপনার টাকার খেসারত দিয়ে ঠিক নিজের সম্পত্তি উদ্ধার করে নিয়ে যাবে; তখন হয়ত' আপনার কিছু লাভ হতে পারে। যতি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে,—ব্যাপারটা কি খুলে বলুন দেখি?

উকিল তখন বুঝিয়ে দিলে,' গভর্ণমেণ্টের নিয়ম ৩০শে তারিখের সূর্যাস্তের মধ্যে সরকারী খাজনা দিতে না পারলে সম্পত্তি নিলামে উঠবে। এমনও হয়, কেউ কেউ ঠিক সময়ের ভেতর অত টাকা

যোগাড় করে উঠতে পারে না। এক জমিদার, নামটি তার প্রকাশ হাজরা, তার নায়েব এসে মহাজন খুঁজে বেড়াচ্ছে। সাড়ে আট-হাজার টাকা সরকারী খাজনার সব যোগাড় হয় নি, তাই ধনী খুঁজচে। সে আমারও মক্কেল কিনা, তাই বলছি, এতে আপনার লোকসান কিছুই হবে না, লাভের মধ্যে এক-দেড়হাজার টাকা আসবে ঘরে। সাড়ে আটহাজার এখনি পূরো দিতে হবে না, চার ভাগের একভাগ দিলেই চলবে।

জমিদারের নাম শুনেই যতির বুকটা ধড়ফড় করে উঠল,—এ যে তাদেরই গ্রামের সেই জমিদার! সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ে গেল, তাদের গ্রাম থেকে রাতারাতি একক্রোশ পথ হেঁটে মামার বাড়ি আসবার পূর্ব দিনের কথা; কাঁদতে কাঁদতে চোখছুটি লাল করে মায়ের জমিদার-বাড়ি থেকে আসবার ছবি; মায়ের সেই নৈরাশ্য ও বিষাদ মাখানো মুখ মনে জেগে উঠল। যতি তখুনি উকিলের সঙ্গে সব বন্দোবস্ত ঠিক করে ফেললে। ওখানকার কাজ শেষ করে সে তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে এসে মায়ের কাছে সকল কথাই বললে। শুনেই মা বললেন,—মহাপাতকী যারা তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে নেই বাবা—তুমি ও কাজটা ভাল কর নি। যতি বললে—আমাদের পৈতৃক ভিটে ত' ঐ লোকটাই গ্রাস করেছে, এই সুযোগে ত' সেটা উদ্ধার হতে পারে। আমরা তার জমিদারীর বদলে আমাদের যথার্থ যেটুকু প্রাপ্য সেটুকু পেলেই খুসী হব, আর এক পয়সাও বেশী চাই না।

রাত তখন প্রায় ৯টা—প্রকাশ হাজরা, তার নায়েব আর উকিল এসে হাজির হল যতির বাড়িতে। এই ছেলেমানুষ—এখনও চব্বিশ বৎসর পূর্ণ হয় নি যার—এতটুকু একটি বালক এই তার জমিদারী

নিলামে ডেকেছে, এ-কথা প্রথমে বিশ্বাস হয় নি প্রকাশ হাজরার। সে ভাবলে, ছেলেটির বাপই বোধ হয় কর্তা। তাই তারা বৈঠকখানায় ঢুকতেই যতি যখন জোড় হাতে তাদের অভ্যর্থনা করলে, তখন জমিদার বাবু মুরুব্বিয়ানা চালে যতিকে লক্ষ্য করে বললেন,—তোমার বাবা যতীশবাবুকে একবার খবর দাও ত'। বল গিয়ে সংগ্রামপুরের—

উকিলবাবু তখন বাধা দিয়ে একটু হেসে বললেন,—ওঁর বাবাকে আর ডাকতে হবে না; উনিই যতীশবাবু—ওঁর কাছেই এসেছেন আপনি।

এঁ্যা—ইনি? আমি ভেবেছিলাম, ইনি তাঁর ছেলে। আপনি ত' এখনও লেখাপড়া করেন, আপনি স্টুডেণ্ট ত'?

বিনীতভাবে যতি বললে,—সত্য বলেছেন, আমি এখনও পড়ি, চিরদিনই পড়ব;—বসুন, বসুন। প্রকাশ হাজরা বসল, তারপর মুরুব্বির মত জিজ্ঞাসা করলে,—আপনাদের দেশ কোথা?

সংগ্রামপুর। শুনেই হাজরা চমকে উঠল,—এঁ্যা, সে যে আমারই জমিদারী!—আপনার পিতার নাম কি?

স্বর্গীয় ধরণীধর চক্রবর্তী।—শুনেই জমিদারবাবুর মুখখানা কালো হয়ে গেল। তার ভাবান্তর সবাই দেখতে পেলে। হঠাৎ যতির নজর পড়ল, ভিতরে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তার মা ইঙ্গিতে ডাকছেন তাকে অন্দর থেকে।

সে কাছে যেতেই তার মা চুপি চুপি বললেন,—অন্য কোনও কথার দরকার নেই। সোজা কথায়, নিজেদের পৈতৃক ভিটে আর সেই সঙ্গে পুকুর আর বাগানটুকু নিয়েই যত শীঘ্র সম্ভব কাজ চুকিয়ে ওদের বিদায় করো। তার বেশী যেন কিছুই দাবী কোরো না, বাবা।

প্রকাশ হাজরা, তার নায়েব আর উকিল এসে হাজির হল যতির বাড়িতে (পৃঃ ১২৬)

তাই হল শেষ অবধি। সব ব্যাপার চুকিয়ে যখন প্রকাশ হাজরা চলে যায় তখন সে যতিকে নমস্কার করে এই কথা বলে গেল,—আপনার মায়ের চরণে আমার শত নমস্কার জানাচ্ছি। তাঁকে জানাবেন, এত দিন পরে আপনার পৈতৃক ভিটাও উদ্ধার হল।

—ছয়—

আমাদের আসল কথাও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। যতির পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ণ হবার আগেই তার প্রায় সকল সাধই পূর্ণ হয়েছিল। প্রাইভেটে ইংরাজীতে বি. এ. ডিগ্রি পাবার পর তার মনে আর একটি যে সাধ ছিল তা বড়ই প্রবল হয়ে উঠল,—সেই কথা এখন বলচি। ছেলেবেলায় তার লেখাপড়া হল না বলে অন্তরের মধ্যে যে দুঃখ ছিল সেটা সে সুদশুদ্ধ উস্থল করে নিয়েছিল এই শেষ ছয় বৎসরে। তার সবার বাড়া শান্তি এই ছিল যে, সে তার মাকে সুখী করতে পেরেছে, আর সেই যে তার মায়ের একমাত্র অবলম্বন সেটাও সে অন্তরে অন্তরে অনুভব করেছে। তার ধারণা এই হয়েছিল যে, মায়ের শুভ ইচ্ছায়, তাঁরই আশীর্বাদে এখন সে দাঁড়াতে পেরেছে,—দেশের পাঁচ জনের মধ্যে তার একটা স্থান আছে। অকালে পিতৃহীন যতি ভাল করেই জানত মায়ের মর্মান্তিক দুঃখের মূল কোথায়। আর মামারা তার মাকে তাঁদের আশ্রয়ে রেখেছিলেন, এজন্য তাঁদের কাছে সে কৃতজ্ঞ। দাশরথি মালির সঙ্গে তার যোগাযোগে এবং ভগবানের কৃপাতেই তার জীবনে এতটা সম্ভব হয়েছে, এ-কথাও সে কোনদিনই ভোলে নি। দাশরথি মালির কাছে তার কৃতজ্ঞতার অবধি ছিল না। সে এখন মাকে সুখী করতে

এবং যথার্থ শান্তিতে রাখতে চায়। এবার সে করলে কি,—দীর্ঘ ছয় মাস কাল সে মাকে নিয়ে ভারতের উত্তর দিকে যতগুলি প্রসিদ্ধ তীর্থ ছিল, সব এমন কি শেষে কেদার বদরিকাশ্রম পর্যন্ত, পর্যটন শেষ করে এল।

মায়ের অভিপ্রায় জেনে কাশীতে একখানি ছোট বাড়িও সে কিনেছে—শেষে তার মা সেখানে বাস করবেন। সেই যে বারো-তেরো বছর বয়সের সময় সে মামার বাড়ি থেকে পালিয়েছিল, তখন থেকে প্রত্যেক দিনের কাজ-কর্মের মধ্যে সে যে সময়টা যে কাজে কাটিয়েছে সে কথা তার স্পষ্ট মনে আছে, বোধ হয় প্রতিটি ক্ষণের খবর তার স্মৃতিতে আগুনের জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা আছে। তার অধ্যবসায়ের ফলে, মুহূর্তের বা ক্ষণকাল সময়ের সদ্ব্যবহারেও সে কখনও ভুল করেনি, তার পূর্ণ ফলও সে হাতে হাতে পেয়েছে। তার প্রত্যেক উদ্যমই শুভ ফল দিয়েছে। এখন মনে মনে সে ভাবে, পরিশ্রমের গৌরব তার জীবনে যেমন সার্থক হয়েচে, এমন খুব কম লোকের ভাগ্যেই হয়ে থাকে।

বৌবাজারের দোকান থেকে কেনা চোদ্দ আনা দামের টুইল সার্ট, পায়ে চটি জুতা আর মাল-কোঁচা মেরে কাপড় পরা ছিল তার সাধারণ পোযাক। কিন্তু তার মধ্যে তার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাব কোনো দিন কেউ লক্ষ্য করেনি। মাথার চুল তার রোজই সুন্দরভাবে আঁচড়ানো থাকত আর ভিতরের গেঞ্জিটিও সে বরাবরই নিজেই কেচে নিত, কখনও চাকরকে কাচতে দেয় নি। এই সে-দিনেও সে তা' করেছে, যখন তার ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স পঁচাত্তর হাজারের উপর পৌঁছেচে আর দুটি কারবারে তার চৌষট্টি হাজার টাকা খাটচে। লোক-সমাজে এখন সে লক্ষপতি বলেই পরিচিত।

এই সময় একদিন হল কি,—

সেদিন সকালে যতি পড়বার ঘরে যখন পড়াশুনো নিয়ে ব্যস্ত ছিল, একজন জীর্ণ কঙ্কালসার লোক ধীরে ধীরে এসে ভিতরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলে···আপনারই নাম কি যতিবাবু? শশব্যস্তে উঠে যতি বিনীত ভাবে বললে,—অনুমতি করুন, আমারই ঐ নাম। শুনে লোকটি বললে,—আমায় চিনতে পারেন? যতির স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর, কিন্তু সে কিছুতেই, অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করেও, ঠিক করতে পারলে না যে কোথায় দেখেছে এই মূর্তি। কেবল এইটুকু মনে হল, ঐ চোখ দুটো যেন দেখা; কিন্তু তার বেশী আর কিছুই সে স্থির করতে পারলে না। লোকটি তখন বললে,—আরও একটু ভেবে দেখুন না।

লোকটির মাথার চুল বেশীর ভাগই উঠে গিয়েছে; যেটুকু আছে তা এমনই কুশ্রী যে দেখতে ইচ্ছা হয় না। চোখের কোলে যেন কে কালি মেড়ে দিয়েছে,—আর চোখ দুটি কোটরে এমন ভাবে ঢুকে আছে যে দেখলে ভয় হয়। লোকটি এত রোগা যে মনে হচ্ছে তার ময়লা ছেঁড়া জামার মধ্য দিয়েও হাড়-গোড় যেন ঠেলে বেরিয়ে আসচে। হাতে একটি লাঠির উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল সে।

যখন সে দেখলে যতি কিছুতেই তাকে চিনতে পারলে না তখন বললে,—আমি অনেক পাপ করেছি বাবা, এখন তার প্রায়শ্চিত্তেরও বুঝি সময় নেই। আর আমি বাঁচব না, তাই একবার তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি। আমি তোমার সেই সেজমামা। আমার পীড়নেই তুমি মাকে ফেলে পালিয়েছিলে, একথা আমি ভুলতে পারি নি কোন দিনই—আজ শেষ সময়ে তাই তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে

এসেছি। তুমি কত মহৎ, আমায় কি মাপ করবে না বাবা ?...বলে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন যতির সেজমামা।

যতি অবাক হয়েই শুনছিল। তুটি বৎসর সে মায়ের নামে যত টাকা পাঠিয়েছিল,—প্রথম বৎসরে প্রতি মাসে পাঁচ আর দ্বিতীয় বৎসর থেকে দশ টাকা করে,—সে সব টাকা ঐ সেজমামাই আত্মসাৎ করেছেন। এ সব কথা,—বাড়ি ভাড়া করে প্রথমেই যতি যখন মাকে কলকাতায় নিয়ে আসে তখনই শুনেছিল। এজন্য তার মনে কোন বিদ্বেষ ছিল না। বুদ্ধিমান্ যতি বুঝেছিল যে দারিদ্র্য আর শিক্ষার অভাবই মানুষকে চোর বা হীনবুদ্ধি করে তোলে। মায়ের উদার স্বভাবটি সে পেয়েছিল। এখন সে তার সেজমামার সব দোষ ভুলে গেল। সেজমামা শব্দটা শুনেই সে একবার শিউরে উঠল বটে, কিন্তু এখন তাঁর আত্মগ্লানি ও অনুতাপ দেখে সে গিয়ে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে সেই হাত মাথায় ঠেকিয়ে বললে,—ও কি কথা বলছেন ? আপনাদের আশীর্বাদেই ত' আমাদের যা কিছু হয়েছে। আপনার শাসনই ত' আমার পক্ষে সৌভাগ্যের কারণ হয়েছিল। আসুন আপনি,—বলে তাঁর হাত ধরে বাড়ির ভিতরে গিয়ে মায়ের কাছে হাজির হল। তার পর মামাকে নিজের কাছে রেখে সেবা আর উৎকৃষ্ট চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিলে বটে, কিন্তু সেই কঠিন রোগে তাঁর আর প্রাণ-রক্ষা হল না। মামার মৃত্যুতে তার যে সাধের কাজটা বাকি ছিল তাও হয়ে গেল। মামাদের্ গ্রামে একটি অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠা করে যাতে বিনা খরচায় সাধারণ গ্রামবাসী জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে চিকিৎসা ও সেবা পায় সেই ব্যবস্থা করলে সে। আর সঙ্গে সঙ্গে তার মান-সম্ভ্রম আর ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠাও শতগুণ বেড়ে গেল। সংবাদপত্রের স্তম্ভে স্তম্ভে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে।

প্রথম হতেই যতির মনে যে গোপন সংকল্পটি ছিল—যার জন্য সে এতকাল ধন-সঞ্চয় করে এসেছে—এইবার সে তা' প্রকাশ করলে। এবার সে তাদের গ্রামে একটি নিম্ন-প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করলে। তার পর সে তার কারবারের এমনই একটা ব্যবস্থা করে ফেললে যাতে দীর্ঘকাল অনুপস্থিত থাকলেও তার ব্যবসার কোন ক্ষতি না হয়। তারপর যত্ন করে মাকে কাশীতে নিজে গিয়ে রেখে এল,—আর তাঁর সুখে স্বচ্ছন্দে থাকবার ব্যবস্থা ভাল ভাবেই করে দিলে।

কাশীতে মায়ের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় জননী তার হাতটি ধরে জিজ্ঞাসা করলেন,—এত সব ব্যবস্থা কেন বল্ দেখি যতি,—তুই কি কোথাও যাবি? গোপন করিস নি আমায়, বল্ বাবা।

যতি বললে,—আর গোপন করব না মা; তোমরা সেকালের মানুষ, যদি আপত্তি কর তাই আগে বলি নি। এখন সব ঠিক হয়ে গেছে—আমি বিলাত যাব।

তার মা স্বপ্নেও ভাবেন নি যে তার ঐ ভাল ছেলেটির মনের মধ্যে এই সঙ্কল্প ঢাকা আছে। শুনেই তিনি প্রথমে বিস্ময়ে খানিক অবাক হয়ে রইলেন,—অনেকক্ষণ তাঁর মুখ দিয়ে কথা বেরুল না। এইবার তাঁর ছেলের অনেক কথাই যেন তিনি বুঝতে পারলেন। আরও বুঝলেন যে, ছেলের এতবড় একটা মহৎ উদ্দেশ্যে, সুধু লোকাচারের জন্য, বাধা সৃষ্টি করা কখনই সঙ্গত হবে না। তার অসাধারণ চরিত্রবলই তাকে সকল বিপদে আপদে রক্ষা করবে। মনে মনে ভগবান স্মরণ করেঁ তাঁরই চরণে তিনি তাঁর প্রাণের নিধিকে সমর্পণ করলেন। শেষে বড়ই করুণ স্বরে বললেন,—একটা কথা আমার রাখ্‌বি, যতি!

মৃদু হেসে যতি বললে,—তুমি যা' বলবে আমি তা' জানি মা। আমি যে কেবল ঐ একটি বিষয়ে এতদিন তোমার অবাধ্য হয়েছি,— তা' কেবল এই জন্যেই। মায়ের চোখে উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন আর বাধা মানল না।

যতি আর বিলম্ব না করে, যতটা শীঘ্র সম্ভব সকল ব্যবস্থা ঠিক করে নিয়ে, তার এতদিনের কাজ থেকে ছুটি নিয়ে বোম্বাই যাত্রা করলে। তার ইউরোপ-ভ্রমণের সাধ আজ কয় বৎসর সে গোপনই রেখেছিল; পাছে কোন বাধা-বিঘ্ন ঘটে তাই সে এ-কথা কাকেও, এমন কি তার স্নেহময়ী জননীকেও, জানায় নি।

—সাত—

দীর্ঘ পাঁচটি বৎসর সে ইউরোপ আর আমেরিকার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়-কেন্দ্রগুলিতে ঘুরেছে—ওদের ব্যবসায়-পদ্ধতিতে বিশেষ ভাবে জ্ঞান লাভ করতে—তার পর ফিরেচে। ফলে সে ফিরে এসে এক আদর্শ কর্মক্ষেত্র গড়ে তুললে। ক্রমে ক্রমে সে এমনই একটি বিশাল ফ্যাক্টরী, দেশের সমবেত মূলধনের উপর ভিত্তি করে গড়ে তুললে, দেখে তার যত পরিচিত ও অপরিচিত লোক অবাক হয়ে গেল। তাতে তৈরী ছিল প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার শ্রমজীবী আর প্রায় পাঁচশত শিক্ষিত ভদ্রসন্তানের উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র। ক্রমে ক্রমে দেশের অন্যতম গৌরবের এবং অশেষ কল্যাণের কারণ হয়েছিল।

তার জীবন-কাহিনী, বিশেষতঃ তার আত্মগোপনের কৌশল এবং অধ্যবসায় গুণটি বড়ই বিচিত্র। এক আনা মূলধন নিয়ে, ছোট

ছোট কাজ থেকে কেমন করে ক্রমে ক্রমে সে এতবড় হয়েছিল, তার নিরহংকারিতার কথা মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে দেশময় ছড়িয়ে পড়েছিল। তার অসাধারণ মাতৃভক্তির কথা অনেকদিন দেশের ছেলেদের আলোচনার বিষয় হয়ে ছিল। আমরা তখন ছোট, মামার বাড়িতে যখন পাঠশালায় পড়ি, তখনই তার কষ্টসহিষ্ণু জীবনের কথা, তার আদর্শ আর বিরাট ব্যবসায়ের কথা মামাদের কাছেই শুনেছিলাম। ভাগ্যের সঙ্গে তার লড়াইয়ের কথা রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছিল চতুর্দিকে আর অনেকের প্রাণে তখনকার দিনে আশার সঞ্চার করেছিল। সংক্ষেপে তার জীবনকথাটুকু আমরা পাঠক পাঠিকাদের উপহার দিলাম।
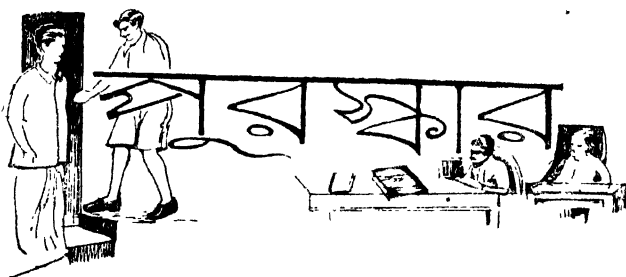
—এক—

স্কুল কলেজে এক শ্রেণীর ছাত্র আছে যারা বেশ লিখিতে পারে, আবার কেউ কেউ বেশ বলিতেও পারে। আমি কিন্তু একজনের কথা জানি সে বলিতেও যেমন তেমনি চমৎকার লিখিতেও পারিত। একটা সামান্য ব্যাপারকে সে এমনই সাহিত্যরূপ দিয়া বর্ণনা করিতে পারিত যে যাহারা শুনিত তাহারা সকলেই মুগ্ধ হইয়া যাইত। যে সকল দেশে সে কখনও যায় নাই, মাসিক পত্রিকা অথবা নানা পুস্তকে তাহার বিবরণ পড়িয়া সে এমনই তাহার বর্ণনা করিত যে মনে হইত যেন সম্প্রতি সে সেই দেশ দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। আমাদের নবীন প্রোফেসার সরকার বলিতেন যে,—যে শাস্ত্র বিভু কখনও অধ্যয়ন করে নাই সেই শাস্ত্রেই সে পণ্ডিত।

হোলি ক্লাব বলিয়া আমাদের এই ক্লাবেও সেই বিভূতি একজন স্টলওয়ার্ট অর্থাৎ মাতব্বর। কিন্তু আদিনাথ সোমও কম ছিল না, একজন কেমিস্ট্রিতে ফার্স্ট ক্লাস,—ফাইন্যাল ইয়ারের ছাত্র সে। নবীন হইলেও সকলে তাহাকে সম্মান করিতাম। এককালে এই আদিই ছিল বাঙ্গালা সাহিত্যে বিভুর প্রতিদ্বন্দ্বী। সে বিভুর লেখার

তীব্র সমালোচনা করিত। গবেষণামূলক রাসায়নিক প্রবন্ধ লিখিয়া আদির একটা নাম হইয়াছিল। বিভু এই সকল প্রবন্ধের মধ্যে সূক্ষ্মভাবে প্রবেশ করিতে পারিত না, কাজেই সে একটু যেন ছোট হইয়াই থাকিত। বিভুর প্রতিভা কিন্তু সাধারণ ছিল না,—আর আদিকেও সে শত্রু ভাবিত না। আদিও জানিত ক্লাবের মধ্যে তার উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী মাত্র একজনই আছে, সে বিভূতি।

যাই হোক্, এই সময় 'বিরাম' পত্রিকায় এই মর্মে একটা বিজ্ঞাপন বাহির হইল যে,—ভূস্বর্গ কাশ্মীর সম্বন্ধে যদি কেহ একটি তথ্যপূর্ণ ও মনোজ্ঞ বৃত্তান্ত লিখিয়া অমুক তারিখের মধ্যে পাঠাইতে পারেন তাহা হইলে নির্বাচিত সর্বশ্রেষ্ঠ লেখাটির জন্য একটি আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হইবে যাহা একশত ত্রিশটাকার কম নয়।

বলা বাহুল্য এ-সংবাদ বিভুর গোচর হইতে বিলম্ব হইল না। কাশ্মীরের নাম শুনিয়া তাহার উৎসাহ প্রবল হইয়া উঠিল, সে যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল। সেই দিনই সন্ধ্যার পর ক্লাবে আসিয়া এক আবেগপূর্ণ বক্তৃতায় জোর গলায় সে ক্লাবে উপস্থিত সবাইকেই শুনাইয়া দিল যে ঐ বিবরণ সে ভাল করিয়াই লিখিবে, আর লেখাতে যে পুরস্কারও লাভ করিবে তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। তিনবার জোরে জোরে টেবিলের উপর চাপড় মারিয়া সে সকলকে সেই কথা জানাইয়া, শুনাইয়া এবং বুঝি অনেকটা বিশ্বাস করাইয়াই দিল।

তাহার এই ভয়ঙ্কর উদ্যম দেখিয়া আমরা সবাই বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেলাম,—কারণ আমরা জানিতাম বিভু কখনও কাশ্মীরে যায় নাই,—এমন কি সে এই কলিকাতার বাহিরে বেশীদূর গিয়াছে কিনা সন্দেহ। এতটা জানিয়াও আমরা তাহার কথার প্রতিবাদ করিতে পারিলাম না,—কাহারো এ সাহস হইল না।

—দুই—

ঠিক এই সময়ে আদি আসিয়া পড়িল,—আমরা যেন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম, আদির মুখ দিয়াই আমাদের ভাষা ফুটিল। সে প্রথমে স্থির হইয়াই বিভুর দম্ভবাণী শুনিয়া লইল। আমরা খুব ভালই জানিতাম যে বিভুর ঐ প্রকার গর্ব কখনও সে মুখ বুজিয়া সহ্য করিবে না, কারণ সে যথার্থ ই বিভুর বন্ধু। কঠিন সমালোচক হইলেও অন্তরে সে গুণের পক্ষপাতী। এখন আদি বলিল,—

দেখ্ বিভু,—একটা বিষয়ে তোকে আমি সাবধান হোতেই বলচি। ও সব পাগলামি করতে যাস নি, আজকাল বাঙ্গালা দেশে লেখকদের মধ্যে কাশ্মীর-পর্যটকের অভাব হবে না। আর তাদের মধ্যেই কারো না কারো লেখা শ্রেষ্ঠ বলে গৃহীত হবে,—তখন তুই জব্দ হবি।

বিভু শুনিল বটে, কিন্তু কোন কথাই কহিল না,—যেন সে ও-সব কথা গ্রাহ্যই করে না এমন ভাবে চুপ করিয়া এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিল। দেখিয়া আদি তাহাকে আবার বলিল,—কি কথাটা কানেও গেল না বুঝি?—বলি, হ্যাঁরে রাস্কেল, তোকে জিজ্ঞাসা করি তোর দৌড়টা যে ই, আই, রেলে মেন লাইনে বণ্ডেল আর ব্রাঞ্চ লাইনে পূর্বস্থলী পর্যন্ত, এটা কি আমরা জানিনে? তোর ঐ আষাঢ়ে গল্প-সল্পই ভাল,—তাই কর্‌না তুই, তোর আবার ওসব খেয়াল কেন বল্ দিকি?

এইবার বিভু কি একটা কথা বলিতে গেল,—গলাটা ভাঙ্গিয়াছে,—সে একটা হুঙ্কার দিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইল, তারপর সতেজে বলিল,—কেন আমার অক্ষমতার সম্ভাবনাটা কোথায় দেখলে, শুনি?

তুই পূর্বস্থলীর পশ্চিমে আর এক পাও বাড়িয়েছিস?

নাইবা গেলাম পূর্বস্থলীর পশ্চিমে এক পাও; কাশ্মীরের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখতে আজকাল এই বাঙ্গলা মুলুক থেকে এতটা রেল ভাড়া দিয়ে গিয়ে, সেখানকার সমস্ত মাটিটা মাড়িয়ে, নিজের চোখে সব কিছু দেখে শুনে লিখলে তবেই সেটা ভ্রমণ-কাহিনী বলে গ্রাহ্য হবে, না হলে হবে না,—এ কথা তোমায় কে বলেচে?

সেখানে না গেলে সে-জায়গার ঠিক্ ঠিক্ বর্ণনা তুই করবি কি করে শুনি? কল্পনার আকাশে ফুল ফোটাবি নাকি?

বিভুর মুখখানি লাল হইয়াছে রাগে, কিন্তু আশ্চর্য তার সংযম, সে দৃঢ় কণ্ঠেই বলিল—দেখো আদি,—এ তোমার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ নয় যে ফার্স্ট হ্যাণ্ড নলেজ না হলে গ্রাহ্য হবে না। আচ্ছা তুমি আমায় বারোটা দিন সময় দাও, আমি তোমায় সন্তুষ্ট করে দেবো। কেবল এইটুকু প্রতিজ্ঞা করো, এ-সম্বন্ধে তুমি কাকেও কিছু বলবে না,—আমার লেখার উদ্দেশ্য যদি সফল হয়!

আর কোন কথা না বলিয়া রাগে গরগর করিতে করিতে এবং ত্বরিৎপদে আদি ঘরের বাহির হইয়া গেল;—প্রায় তাহার পশ্চাতেই বিভুও চলিয়া গেল। বারোটি দিন সে আর এখানে আসিল না। বাড়ির বাহির হইয়াছিল কিনা সন্দেহ,—বোধ হয় কেহ তাহাকে পথেঘাটে কোথাও দেখে নাই এই বারো দিন।

আমরা ইতিমধ্যে তাহার নামে এবং তাহার সম্বন্ধে কত কথাই জল্পনা কল্পনা করিয়াছি, তাহার অগোচরে কত কথাই তাহার সম্বন্ধে বলিতে দ্বিধা করি নাই। আমাদের মধ্যে যে-সকল কথা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া হইয়াছিল তাহা তাহার সম্মুখে কখনই হইতে পারিত না, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই,—আমাদের অবশ্য তাহা

করা উচিত ছিল না,—কিন্তু তাহা আমরা করিয়াছিলাম খানিকটা অভ্যাসবশে এবং খানিকটা আমোদের জন্যও বটে।

ঠিক বারোটি দিন পরে বিভু তাহার লেখাটা শেষ করিয়াছে এবং একবার আদিকে শুনাইতে এইখানে লইয়াও আসিয়াছে।

চেহারাটা তাহার ভয়ানক ক্লান্ত,—শরীর যেন অবসন্ন; কিন্তু তা' বলিয়া তাহার মনে ক্লান্তি নাই, অবসাদও নাই। উৎসাহ তাহার পূর্ণই রহিয়াছে, তাই লেখাটা পাঠাইবার আগে যখন সে একবার আদির কাছে শুনাইতে চাহিল, আদি কি জানি কি ভাবিয়া কিছুতেই রাজী হইল না। বলিল, এখন ওটা আর শুনে কি হবে? তারপর যেন একটু শ্লেষের সুরেই বলিল,—একেবারে যখন পুরস্কার ঘোষণাটা কাগজে বেরুবে তখনই ভাল করে ওটা দেখা যাবে।

—তিন—

আশ্চর্য কাণ্ড,—যেদিন পত্রিকাটা পাওয়া গেল, দেখা গেল এই খবরটা বাহির হইয়াছে।

মোট ছয়টি লেখার মধ্যে, গণপতি হালদার আর বিভূতি দত্ত এই দু'জনের লেখাই সুন্দর বা উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। এখন, এই দু'জনের লেখাই এমনই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে এই দুইটি লেখার মধ্যে একটিকে রাখিয়া অপরটিকে সুযোগও দেওয়া যায় না। কাজেই এই দু'টির মধ্যে কাহাকে পুরস্কারটা দেওয়া ঠিক হইবে ইহা লইয়া কর্তৃপক্ষ একটু মুস্কিলেই পড়িয়াছেন। বিশেষ কারণে টাকাটা বিভক্ত হওয়াও আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। এখন এই পত্রিকার নিয়মিত পাঠকেরা যদি নির্বাচনের ভার গ্রহণ করেন তবেই সুবিচারের আশা

করা যায়। দুইটি লেখাই আগামী সংখ্যায় একসঙ্গেই বাহির হইবে এবং গ্রাহকগণ উহা পাঠ করিয়া অমুক তারিখের মধ্যে তাঁহাদের মন্তব্য প্রকাশ করিলে, মত-সংখ্যা হিসাব করিয়া পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হইবে। মোট-কথা পাঠকগণের উপর বিচারের ভার থাকিবে এবং ইহাই সুবিচারের একমাত্র উপায় বলিয়াই আমরা মনে করিয়াছি।

পুনরায়, বিভুর সঙ্গে যখন আদির সাক্ষাৎ হইল,—বিভুর মুখে উৎসাহহীনতার কোন লক্ষণই নাই, বেশ স্ফূর্তি ছিল তাহার মুখে। তাহা লক্ষ্য করিয়া আদির সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল।

সে বলিল,—দেখ্, অত লাফালাফি করিস্ নি, এইবার তোর বিদ্যা প্রকাশ হয়ে যাবে।

বিভুর মুখে সরল চাঞ্চল্যের হাসি, সে কোন উত্তেজনা প্রকাশ করিল না বা বিরক্তও হইল না, সহজ প্রীতিমাখানো মিষ্ট কণ্ঠে বলিল,—সে যাই হোক্ এখন তুমি একবার পড়ে একটা মতামত দিলে তবেই না বুঝতে পারি। তবে আবার বলে রাখি শোনো—তুমি কিন্তু আমার উপর অবিচার কোরোনা, হে আদিত্য! আমরা তোমার ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধা করি।

আদির মুখ ভারি হইয়া উঠিল সে কোন কথা না বলিয়া দ্রুত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। তা সত্ত্বেও বিভু চীৎকার করিয়া বলিল, তোমার ভোট আমার তত দরকার নয়,—কিন্তু সুবিচারটি যেন পাই। কথাগুলি আদি না শুনিয়া এড়াইতে পারিল না।

বিভুর সাহস ও নিঃসঙ্কোচ ভাবটা সত্যই আমাদের মধ্যে বেশ একটা সহানুভূতিমূলক উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়া দিল। সকলকার মনেই তাহার প্রতি একটা প্রবল পক্ষপাতিত্ব দেখা দিল। ও ত'

আমাদেরই একজন, ও পুরস্কার পেলে আমরা যথার্থই সুখী হই। আমাদের মধ্যে প্রবল আলোচনা আরম্ভ হইয়া গেল ঐ কথা লইয়া,—কেমন করিয়া বিভুকে শ্রেষ্ঠ পুরস্কারের অধিকারী করা যায়।

আমাদের ঐ সব আলোচনা হইয়াছিল, তাহার লেখা পড়িবার আগেই। যথা সময়ে যখন তাহাদের দুইজনের লেখা আমাদের পড়িবার সুযোগ উপস্থিত হইল তখন আমরা মুগ্ধ না হইয়া পারি নাই। বিভু সুধু যে তাহার বর্ণনাকে জীবন্তই করিয়াছে তাহা নহে,—যে কখনও কাশ্মীর যায় নাই সে কেমন করিয়া এত স্পষ্টভাবে শ্রীনগরের পথ-ঘাটের, এতটা প্রাঞ্জল বর্ণনা করিতে পারে! তাহার আরও এক আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য, দেখা গেল শ্রীনগরের রামভুজ নামে এক যুবকের সঙ্গে তাহার বন্ধুত্ব, তাহার ঘর-সংসারের কথা, এমন কি তাহার ঘরে যে-সব বাসন-কোষণ আছে তাহার বর্ণনা, তাহার ভগিনীর অতিথি-সৎকার প্রভৃতির বর্ণনা এমন চিত্তাকর্ষক ভাবে এই সকল খুঁটিনাটি বিবরণ এমন হৃদয়গ্রাহী ভাবে করিয়াছে যে তাহা পাঠ করিয়া বিস্মিত না হইয়া পারা যায় না। কল্পনাই হোক্ আর যাহাই হোক্ তাহার এই লেখাটি জয়মাল্য আনিয়া দিবে তাহার গলায়। আমরা তাহার শক্তির পরিচয় পাইয়া ধন্য হইলাম, এবং এই কামনাই করিতে লাগিলাম।

—চার—

বিভুর যে প্রতিদ্বন্দ্বী গণপতি হালদার,—তাহার লেখাও চমৎকার। তাহার লেখার মধ্যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ছাপ সর্বত্রই স্পষ্ট রহিয়াছে। বিশেষতঃ সে চারিটি মাস কাশ্মীরের নানাস্থানে ভ্রমণ

করিয়া বহু তথ্য সংগ্রহও করিয়াছে। তার লেখাটা সাধু ভাষায়, আর বিভু লিখিয়াছে কথ্য ভাষায়,—দরদে ভরা। সেইজন্যই আরও তাহার লেখাটা যথার্থ ই মনোজ্ঞও হইয়াছে।

যাই হোক, আদি আসিয়া যখন গম্ভীর ভাবে বলিল,—দেখ্ বিভু! তোর উপর অবিচার করবোনা বলেছি; তা' সে সত্য আমি রাখবো। তোর লেখাই ভাল হয়েচে, যথার্থ ই ভাল হয়েচে—এ সকলেই বলবে, যতই কঠিন সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে দেখুক্‌না কেন। আমি নিজেই আকৃষ্ট না হয়ে পারিনি, আর আমার কোনও রাগ নেই তোর উপর। কিন্তু আমি তোর পক্ষে ভোট দিতে পারবো না, কারণ আমরা জানি তুই কখনও সেখানে যাসনি। বিভু কিছুই বলিল না, কেবল ঠোঁটের ফাঁকে একটু হাসিল মাত্র—বিজয়ীর হাসি।

আদির ভোট না পাইলেও বিভুর লেখাটাই শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পাইল। আমরা সকলেই খুসি হইয়া এই ক্লাবেতেই এক ভোজের আয়োজন করিয়া ফেলিলাম, সে দিনটিও শনিবার,—আদিও উপস্থিত ছিল। সে বিভুর একখানি হাত ধরিয়া যেন মিনতির সুরেই বলিল,—তুই সত্য বল্ ত' কেমন করে শ্রীনগরের পথের ঐ বর্ণনাটা পেলি?

বিভু কি বলিতে গেল, এমন সময় ক্লাবের বেহারা একখানা কার্ড আনিয়া তাহার হাতে দিল। কার্ডখানা লইয়া সে আলোর দিকে ফিরাইয়া বিস্ময়-বিজড়িত কণ্ঠে পড়িল,—গণপতি হালদার, এম. এ., জিওলজিষ্ট।

ভয়, বিস্ময় ও কৌতূহলমিশ্রিত একটা আবেগে আমরা অস্থির হইয়া পড়িলাম—ঐ নামটি কানে যাইবামাত্র। তারপর দেখিলাম বিভু ব্যস্তভাবে দরজার পানে ছুটিতে লাগিল,—আমরাও যাইব কিনা ভাবিতেছি,—এমন সময় সম্মুখে দেখিলাম এক অপরূপ পুরুষ মূর্তি।

সাড়ে ছয় ফুট লম্বা, পায়ে আজানু মোটা হোস্ আর মোটা জুতা; হাফ্‌প্যান্ট তার উপর খাকি সার্ট। মাথায় এলবার্ট-তোলা বাঁয়ে টেরী, —কার্তিকের মত মানানসই দু'ধারে ছুঁচালো গোঁফ, গৌরবর্ণ মূর্তি, মুখে মৃদু হাসি, সুমুখের দুটি দাঁত একটু বড়—তাহাতে মনে হয় যেন সদাই হাসিমুখ।

ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া সেই ব্যক্তি তাহার বিশাল দক্ষিণ বাহু প্রসারিত করিয়া বিভুর হাতখানি গ্রহণ করিল,—তারপর,—মাই কন্‌গ্রাচুলেশনস্,—বলিয়া ঝাঁকুনি দিয়া আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিল,—

আমি চারটি মাস ওখানে থেকে যা করতে পারিনি, ইনি পাঁচ-ছয়দিন মাত্র থেকে তার ঢের বেশী করেছেন;—কেমন, ঠিক্ কিনা?

লোকটি বেশ সরলও বটে কিন্তু বিস্ময়ে আমাদের অবাক করিয়াছে,—বিভুকেই সে চিনিল কি প্রকারে। ব্যবহারটা ত' দস্তুরমত পরিচিতের মতই লাগিতেছে।

আদিও কম আশ্চর্য হয় নাই,—সে বলিল—আপনার সঙ্গে কি বিভুর পরিচয় ছিল,—আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীটিকে কি আপনি চিনেন?

বিভুর মুখের দিকে একটা বক্র দৃষ্টি হানিয়া, গণপতি বলিল,—বিলক্ষণ, শ্রীনগরে রামভুজের বাড়িতে আমরা দু'জনে একসঙ্গে যে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলাম,—আবার একই সঙ্গে রওনা হয়ে হাওড়ায় এসে পৌঁছেচি, জুন মাসের আট তারিখে সকালে।

আমরা অবাক্, বিস্ময়ে স্তব্ধ,—মনে হইল, সেই যে তাহার বারোটি দিন সময় নেওয়া—আমরা ভাবিয়াছিলাম, লেখাটা প্রস্তুত করবার জন্যই—তাহার মধ্যে সে কয়দিনই বা কাশ্মীরে থাকিল!

বিভু বলিল—মোটে পাঁচটি দিন আর চারটি রাত থাকা, আর—

বাধা দিয়া আদি বড় সঙ্কুচিত হইয়া বলিল,—বিভু! আমি তোর উপর অবিচার করেছি, আমার—

প্রসন্ন মুখে বিভু তাহাকে বাধা দিয়াই বলিল,—নেভার্ মাইণ্ড্,—মাই ডিয়ার বয়।

তা সত্ত্বেও আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি বিভু তাহার অন্য অন্য বহুতর কাশ্মীরের বৃত্তান্ত পাঠের অভিজ্ঞতাও কাজে লাগাইয়াছে।

—এক—

'বারেক ফিরিয়া দেখ, তরুণ, তপন।'

যার কণ্ঠ থেকে এই কথা কয়টি বেরিয়ে এল সে একটি এগারো বারো বছরের মেয়ে, নামটি তার নীলিমা;—আর যাদের উদ্দেশ্যে বেরুল তারা দুটি ছেলে,—তরুণ আর তপন; নীলিমার দুটি ভাই। ভাই দুটিই বড়; তরুণের বয়স ষোলো আর তপনের আঠারো।

এখানে তাদের পড়াশুনার কথা আমাদের বক্তব্য নয়—যদিও তারা নিজ নিজ শ্রেণীতে খুব ভালো ছেলে,—তরুণ আই এ., আর তপন ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ে।

নীলিমার কথা শুনে তপন দাদা বললে,—

ওরে মূঢ়মতি চপলা নীলিমা,—
শোন্ বলি আজ,
দগ্ধ করি তোর মুণ্ডে,—
ঘুচাইব কাজ।—

ব'লে তপন রুষ্টভাবে ভগিনীর দিকে চেয়ে দেখলে। তরুণ বললে, কেন রে তুই নীলি পিছনে ডাকিলি,—খেলাটা আজ দেখি তুই-ই মাটি করিলি,—

ভরার চেয়ে শূন্য ভালো যদি ভরতে যায়, আগের চেয়ে পিছন ভালো, যদি ডাকে মায়,—বলে নীলিমা পিছন ফিরে ভিতর পানেই চলল। তখন দু'জনেই বুঝলে মা ডেকেছেন।

মা শয্যাগত—অনেকদিন অসুখে ভুগছেন। এখন একটু ভালো, উঠে বসছেন।

মা বললেন,—হাঁরে, আমায় না বলে তোরা যে চলে যাচ্ছিলি?

তরুণ বললে,—একটু সুস্থ হয়ে ঘুমিয়েছিলে, তাই আর জাগাইনি মা! ডাক্তারের বারণ—জানো তো?

তা' বলে তোরা বেরিয়ে যাবি সে সময়ও আমি ঘুমিয়ে থাকবো, তাও কি হয়? আজ তোদের ম্যাচ খেলা আছে না?

হ্যাঁ, মা!

সেই জন্যই তো আমি জেগে উঠেছি ঠিক সময়ে। এই কথাটি বলে, আদর করে তাদের দু'জনের মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন,—যা, এইবার তোরা।

দু'জনে তাঁকে নমস্কার করে বেরিয়ে গেল।

যেতে যেতে তরুণ বললে,—তপা, আজ আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী, দেখবি।

তপন বললে,—আমারও মনে ঠিক ঐটাই বলছে দাদা।

কেন বল্ দেখি?

এই যে মা ডেকে আশীর্বাদ করলেন,—এমন তো কখনও ঘটেনি।

যথার্থই আজ সুপ্রভাত, দু'জনেই মনে করলে ঐ কথাটা।

সন্ধ্যার পর দু'জনে এসে খেলার কথা মায়ের গোচর করলে। মা জিজ্ঞাসা করলেন,—কেমন খেলা হোলো রে তরুণ, আমায় বল্ তো,

গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত বলবি, একটুও বাদ দিস্‌নি। আমি সব কথাই শুনতে চাই।

—দুই—

মা সারা দিনরাত শুয়েই আছেন,—ছেলেরা এসে কাছে বসলে তাঁর বড় ভাল লাগে। তাদের কথা শুনতে তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেন; তখন উঠে বসেন, আনন্দ পান, সেইজন্য সন্ধ্যার পর দুই ভাই-ই খানিকক্ষণ তাঁর কাছে থাকে।

এখন তরুণ,—ভিজে মাঠ থেকেই খেলার কথা বলতে আরম্ভ করলে। মাঝে মাঝে যখন সে কোথাও ছেড়ে গেল বা ঠিক মত বলতে পাচ্ছিল না, তপন মনে করিয়ে দিতে ভুললে না। এই ভাবে বলতে বলতে এক জায়গায় তরুণ যখন বললে,—ওরা এসে আমাদের গোলের উপর এমন করে চেপে পড়ল, দেয় বুঝি গোল, এমন সময়,—এই পর্যন্ত বলেই তরুণ চুপ করলে, তার মুখখানি রাঙা হয়ে উঠল। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মা মৃদু হেসে বললেন,—বল্, থাম্‌লি যে?

তখন তপন বললে,—দাদা ওখানটা বলতে পারবে না, ওখানটা আমি বলি শোনো—এমন সময় তরুণ ব'লে আমাদের যে রাইট হাফ্ব্যাক্, সে ধূমকেতুর মত এসে এমন চমৎকার একটি হেড্ করলে যাতে বল একেবারে ওদেরই দিকে গিয়ে পড়ল—তারপর,—

এবার তপনের মুখ লাল হয়ে উঠল। সে চুপ করে রইল দেখে তরুণ বললে,—এইবার আমি বলছি মা, শোনো—তপন নামে আমাদের সেণ্টার ফরোয়ার্ডটি বলটাকে দ্রুত ক্যারী করে এমনভাবে

নিয়ে গিয়ে তাদের গোলের কাছে ফেললে যে তারা তো একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল। তখন তপন এক স্যুটে তাদের গোলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে বলটা। এই একগোলেই আমাদের জয় হল। তারপর আর কেউ কোন গোল দিতে পারেনি, যদিও ওরা এমন চেপে খেলছিল যে সকলেই আমরা ত্রাহি মধুসূদন ডাকছিলাম।

তপন বললে,—তার মধ্যে ওরা আরও একবার বলটা গোলের কাছাকাছি এনেছিল, একজন কেউ একটু তৎপর হলেই বোধ হয় গোল দিয়ে দিত ;—সেবারেও তরুণদাদা এমনই কৌশলে বলটাকে ফেরালে, সকলে ধন্য ধন্য করে উঠল। এই হল আজকের খেলার বৃত্তান্ত, মা। তোমার আশীর্বাদে—

মা বললেন,—দেখ্, তোদের আজ একটি কথা বলে দি,—যে যার নিজের শক্তিতেই খেলে আর জয়-পরাজয়টা হয় শক্তির তারতম্যে শুধু নয়, খানিকটা ভাগ্যেও। অনেক সময় হয়ত দেখা যাবে যে, যারা পূর্ণশক্তিমান জানা ছিল তারাই হঠাৎ হেরে গেল। কিংবা একটু সময়ের এদিক ওদিকে তাদের জয় হোলো না। আবার শক্তিশালী দল যারা, তাদের হয়ত এমন অহঙ্কার থাকে যে, ভাবে ওদের সঙ্গে আমরা আবার খেলব কি? ওরা তো নিকৃষ্ট। সেই গর্বেই তারা কেউ ভাল করে খেললে না গ্রাহ্য করে—তাতেই হেরে যায়।

উৎসাহিত হয়ে তরুণ বলে উঠল,—ঠিক মা, আজও আমাদের সঙ্গে যারা খেলেছিল তাদেরও তাই হয়েছিল। খেলাতে নেমেই তাদের ক্যাপ্টেন জোর গলায় বললে, আজকের রেজাল্ট্—ফোর টু নীল্, ইফ্ নট্ মোর্। তাই শুনে আমাদের অনেকেই নিরুৎসাহও হয়েছিল। তপনের প্রথম গোলটা বাঁচানো থেকেই সকলের

উৎসাহ ফিরে এল। ওরা ভয়ানক চেপে খেলেও কিছু করতে পারেনি।

নীলিমা আগাগোড়া সব কথাই শুনছিল। সে ভারি কবিতা-

ভক্ত। কবিতা, না হয় ছড়া ব'লেই সে বেশীর ভাগ সময় কথার উত্তর দিত।

সে বললে—খেলার যে জয় সে তো জয় নয়;—

কাজের বেলায় সজাগ থাকিলে
জনসেবা দিয়ে সবারে বাঁধিলে,
সবারে আপন করিতে পারিলে—
তাহাতেই হয় জয়।

তরুণ বললে,—আচ্ছা মা, নীলি এমন পণ্ডিত, এমন কবি এই অল্পবয়সেই কেমন করে হ'ল বল দেখি ?—

মা বললেন, তা বুঝি জানিস নি ? ও যে এবারে পদ্য রচনায় প্রথম হয়েছে ওদের ক্লাসে,—ওদের হেড্‌মিসট্রেস সেদিন আমায় দেখতে এসেছিলেন ; বললেন,—নীলিমা স্বভাব-কবি। নীলি, তোর সেই ভাত আর রুটির-কবিতাটা বল্‌না, দাদারা শুনুক্ ?

—তিন—

নিঃসঙ্কোচে নীলিমা খাতাখানি বার ক'রেই বলতে আরম্ভ করলে ঃ—

তোমরা সবাই ভাত খেয়ে যাও চলে,
যে যাহার কাজে, দেখ না চেয়ে কি খেলে।
বামুনঠাকুর আমাদের দেয় ফ্যান-ফেলে-দেওয়া ভাত
তাই তো এমন দুর্বল শরীর আমাদের এই জাত।
দেখেছ কি ভেবে ইহার জন্য যথার্থই দায়ী কে ?
সবার আগেতে আমি বলি দোষী বাড়ির কর্ত্তা যে।

তারপরে দোষী আমাদের ঐ বাড়ির গিন্নিটি,—
তাঁর কথা ওমা ! ফ্যান না ফেলিয়ে ভাত রাঁধা যায় কি ?
ফ্যান না ফেলিয়ে, নিজ হাতে মেখে, খেতে বলো কি পিণ্ডি
কোন কালে যা' কেউ করেনিকো, হেমা হাড়ি-ঝি চণ্ডী।
ঘরে আরো আরো বৌ ঝি যাহারা, গতানুগতিক চায়,
যা হয়ে এসেছে, তাই না করিলে, যত ল্যাঠা বেড়ে যায়।
কত না ব্যথায় ব্যথিত হইয়ে, কবিগুরু বলে, হায় !
আমাদের খাদ্যপ্রাণ, নরদামা পথে নিত্য চলিয়া যায়।
যে কয়টি লোক তোমার ঘরেতে, যত কটি চাল খায়
সেই মত জল, ঠিক মাপে দিলে, ফ্যান কি ফেলিতে হয় ?

বিস্মিত তপন, বুদ্ধিমতী ছোট বোন্‌টির দিকে চেয়ে প্রসন্ন বদনে বললে,—কৈ এত দিন ত নীলিমার মুখে এ সব কিছুই শুনিনি। দেখছি ওর পেটে পেটে বুদ্ধি,—বটে ?

মা সহর্ষে বললেন,—ও কি কাকেও দেখায় ? আমায় পর্যন্ত দেখায় নি আগে। আচ্ছা এখন বল্ তো,—তোর ঐ রুটির কথাটা,—

নীলিমা আবার আরম্ভ করলে,—

ঐ যে গম পেশা মোটা আটা,—
তার প্রতি কণাটির মাঝে রক্তবিন্দু, দুধের যেমন মাটা।
সাদা ময়দার লুচি ভাল নয়, তার চেয়ে ভালো রুটি,
দুবেলা খাইলে পরম পুষ্টি, তার সাথে ভাত দুটি।
অভ্যাস হইলে দু'বেলা চালাও ঘুচে যাবে দুর্বলতা
শরীরে হইবে পুষ্টি পূর্ণ, থাকিবে'না অলসতা।
মুগ ছোলা আর মটর বিউলী, তার সাথে খেয়ে যাও
কিছুদিন খেয়ে পরীক্ষা করিয়ে, দেখ না কি ফল পাও।

চিনির চাইতে গুড় খাওয়া ভাল, জেনো তুমি মনে মনে,
পরিষ্কার, স্বচ্ছ সোনার বরণ ভালো দানাদার জেনে।

আরে নীলি,—তোর রান্না আর খাওয়ার ব্যাপারে যে দেখি উঁচুদরের হাইজিনিক বুদ্ধির বিকাশ হয়েছে,—এটা ভালো,—কিন্তু শুধু খাদ্য সম্বন্ধেই লিখেছিস্,—নাকি আর কিছু আছে ভালো—

মা বললেন,—তা' কেন,—পোষাকের দিকেও ওর খুব খর দৃষ্টি আছে, আর তাও কম কথা নয় ; বল্ না, দাদাদের শুনিয়ে দে না—

—চার—

তখন নীলিমা আবার আরম্ভ করলে। তার গলার স্বর কোমল, কিন্তু তাহলেও তার মধ্যে একটা এমন তেজ ছিল যা সময় সময় তার ভাষাকে ফুটিয়ে তুলত, আর জায়গা বিশেষে এক অপূর্ব ভাবে নাচিয়ে তুলত তাদের যারা শুনত। এখানে জেনে রাখা ভালো যে, নীলিমা ছিল খুব ভালো একটি মেয়ে যার আবৃত্তির খ্যাতি তাদের স্কুলের মধ্যে উপর ক্লাসেও ছড়িয়েছিল। এখন সে আবার খাতা থেকে পড়ে চলল ;—

লজ্জার কথা বাঙ্গালী বাবুর, ঝোলানো লম্বা কোঁচা।
শক্তি, গুণপনা পুরুষের যেটি, একেবারে যেন মোছা।
শ্রমেতে কাতর বাবুদের চাই আরাম সকল কাজে,—
কাটাইতে চান হেসে খেলৈ দিন, কথা যাহা কিছু বাজে।
আদ্দির পাঞ্জাবী গিলেকরা হাত, বাঁ হাতে কোঁচাটি ধরা,
পিছনে ফিরানো বুরুশিত চুল, না কেতে প্যাশনে পরা।

শীর্ণ দেহটি, দুর্বল বাহু, ধুক্ ধুক্ করে প্রাণ,
মুখে তবু মোটা হ্যাভানা সিগার, কাশি আসে দিলে টান।
সকল দেশেই পুরুষের দেহে আছে যে সবলতা,
আদর্শ বাঙ্গালী যুবার স্বভাবে বিপরীত দেখি হেথা।

তরুণ আর তপন মোটেই রোগা ছিল না; বেশ হৃষ্টপুষ্ট শরীর তাদের, তবুও তরুণ চঞ্চল হয়ে উঠল। সে বললে—হ্যাঁরে নীলি, কেন বল্ দেখি এতটা শ্রদ্ধাহীন ভাব আমাদের উপর; দোষের এতটা কঠিন বিশ্লেষণ তুই কেন করতে গেলি? সত্য হ'লেও তোর মুখে বড় রূঢ় শোনায়, না মা?

মা বললেন,—ভিতরে ওর একটা ব্যথা আছে আমি জানি, তবে হয়ত একটু জোর হয়েছে সেটা প্রকাশ করতে গিয়ে।

তপন তখন বলে,—এতটা তীব্র শ্লেষ ছোট মেয়ে হয়ে যা' করেছে বোধ হয় আগে কেউ এতটা করেনি। এখন তোর কি রকমটা চাই সে সব কিছু ভেবেছিস, না কি শুধু দোষ দেখানো আর নিন্দাই সার?

মা বললেন,—ওর মৎলব (আইডিয়া),—নেই আবার? ওর কত সাধ! শোন্ না ও কি বলে?—

নীলিমা আরম্ভ করলে আবার—

—পাঁচ—

ছেলেরা হবে স্মার্ট, সকল দিকেতে সেরা,—
হাত-কাটা খাকি সার্ট, হাফ প্যান্ট এঁটে পরা।
শীতে গরমের দিনে তাই প'রে যাও স্কুলে,
আদ্দি রেশমের ঠাট পুরুষে সাজে না মূলে।

পাঠশালা থেকে স্থুরু, কলেজ বিভাগ শেষে,
বাইরের যতো কাজে মানাবে একই বেশে।
উৎসবের সাথে থাক্ ধুতি-পাঞ্জাবী চাল,
তাহার উপরে জড়াও না কেন দেশীয় পশমী শাল।
বনাত মলিদা তাপ্তা তুঁষ, মানে কেউ কম নয়,
পুরানো দিনের হলেও শাল দোশালারই জয়।
হতে চাও যদি বীর, স্বাস্থ্যই গোড়ার কথা,—
স্বাস্থ্য পরম-স্থুখ, না হলে সকলি বৃথা।
স্বাস্থ্য হতেই গুণ,—তা হতে সরস প্রাণ,—
সাধনের বলে মিলিবে নিশ্চয়,—শক্তির মহৎ দান ॥

চমৎকার নীলিমা, তোর উপর আমাদের শ্রদ্ধা আজ যে কতটা বেড়ে গেল কি আর বলবো, কিন্তু তোর আদর্শ টা এখনও ঠিক বোধ হয় সকলে মেনে নিতে পারবে না। মনে কর্ পাঠশালার ছেলে থেকে স্থুরু করে স্কুল ও কলেজের ছাত্র, এমন কি সকল কর্মক্ষেত্রেই ঐ এক রকম পোষাক, হাতকাটা খাকি সার্ট আর হাফপ্যাণ্ট, সারা বাঙ্গলা দেশেই চলবে কি,—অবশ্য হলে চমৎকার হয় বটে, কিন্তু—

নীলিমা ভ্রূকুঞ্চিত করে বললে,—কিন্তু কেন দাদা, আমাদের সারা বাঙ্গলায় এটা অসম্ভব হবে কেন? এক দেশে যেটা হতে পারে, অন্য দেশে তা হবে না কেন? খরচের দিক দিয়ে কি বেশী হবে, তাই মনে করেছ?

মোটেই তা নয়;—খেতে না পেলেও সখের ব্যাপারে খরচা করতে, এমন কি ধার করে খরচ করতে বাঙালী কখনও পেছ্‌পাও হবে না, সে দিক থেকেও নয়,—এর অন্য দিক আছে। ঐ ফিন্‌ফিনে পাতলা ধুতির মোহ, সৌখিনতার মোহ,—

নীলিমা বললে,—সেটা তো সামাজিক উৎসব আনন্দে চলবে, কেবল স্কুলে কলেজে এবং খেলাতে ধূলাতে কিংবা কর্ম্মস্থলে ঐ এক-রকম বেশভূষা সারা দেশেতে চলে গেলে কেমন হয় বলো দেখি ?—

সকলেই বলবে, সুন্দর, বাস্তবিকই সুন্দর,—যেন স্কাউট।

প্রথমে বাঙ্গলায় হোক্, তারপর সারা ভারতবর্ষে।—

তুফান মেলে অবাক কাণ্ড

১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসের শেষ। শীত পড়ে এসেছে। যাবো দিল্লী, কালীপূজার ঠিক দু'দিন আগে। ভীড়ের কথায় আর কাজ কি! গাড়ি ছাড়বার প্রায় একঘণ্টা পূর্বে স্টেশনে গিয়েছিলাম। তৃতীয় শ্রেণীর একটা কামরায় ছোট সুটকেশ আর ভদ্রভাবে বাঁধাছাঁদা ছোট বিছানাটি আর জলের কুঁজোটি নিয়ে তো উঠলাম। দেখি আমারও আগে যাঁরা এসেছেন, তাঁরা একেবারে বিছানা বিছিয়ে কায়েম জায়গা দখল করে নিশ্চিন্ত হয়ে আধা-শুয়ে আধা-বসে আনন্দেই খোসগল্প জুড়ে দিয়েছেন; কে উঠল না উঠল তাঁদের লক্ষ্যের বিষয়ই নয়।

সামনাসামনি দু'খানা বেঞ্চে দেখি, দুইজন দিল্লীওয়ালা নিজ নিজ বিছানায় এই দিন-দুপুরে শুয়ে জায়গার দখল রাখছেন। সুটকেশটি বেঞ্চের তলায় আর বেডিংটা বাঙ্কের উপর একরকম ক'রে ঠেসে ঢুকিয়ে, একটু ভদ্রভাবে মিয়াঁ একজনের মুখের দিকে তাকাতেই তৎক্ষণাৎ তিনি নম্রভাবে, বৈঠিয়ে বাবুজি,—এই, বাবুজিকো বৈঠ্‌নে দেওনা, বলে তাঁর সামনের দোসরকে হুকুম করলেন। তামিল করবার লোক কাছে থাকলে হুকুম করাটাই এক জাতীয় সামাজিক রীতি।

যাই হোক, সামনের মিয়াঁ বিছানা একটু গুটিয়ে নিতেই একটু বসতে জায়গা পেলাম। তারপরেই প্রশ্ন হল,—যাবেগা কহাঁ? দিল্লী যাব শুনে তাঁর মুখ থেকে,—বৈঠিয়ে না, মজেমে বৈঠিয়ে,—এই কথাটা বেরিয়ে গেল। কিন্তু বেশী মজেমে বসার সুবিধা হল

না, কারণ যেটুকু বিছানা গুটিয়ে তিনি আমায় বসতে জায়গা দিয়েছিলেন তার মধ্যে আর যেমন করেই হোক না কেন, মজেমে বসে যাওয়া চলে না। এটা তিনি দেখেও আর দেখলেন না।

যাঁর ভাগে আমি পড়লাম, সমস্ত বেঞ্চিখানা ভরেই তাঁর বিছানা পাতা ছিল। তাঁর মাথায় কাঁচাপাকা ছোট ছোট চুলের উপর ছিল একটি গোল, সাদা, জালের মত কাপড়ের টুপী, আর গায়ে আপাদ-লম্বমান সাদা ময়লা আলখাল্লা। দাড়িও কাঁচাপাকা, শরীর প্রায় কৃষ্ণবর্ণ, হাতে একটি মালা। তৃতীয় ব্যক্তিটি সৌখিন, গায়ে সূক্ষ্ম মসলিনের আজানুলম্বিত জামা, ভিতরে জালের গেঞ্জি, আর চুড়িদার পায়জামা। দিল্লীর এক জোড়া লপেটা পায়ের কাছেই রাখা। বয়স প্রায় চল্লিশ, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। সৌখিন জামার পরিচয় আরও একটু আছে। গলায় অতি সূক্ষ্ম সূচের কাজ-করা বেলদার হাঁসুলী, আর দুই কাঁধে ও পিঠে সূক্ষ্ম ঐ ভাবের কাজ-করা পান। খস্ আতরের গন্ধ ভুরভুর করছে আশপাশে,—মেজাজ-সরিফ ব্যক্তি। কথায় কথায় পরিচয় দিলেন, দিল্লী শহরের খানদানী লোক তাঁরা। এখন কোন মাদ্রাসার শিক্ষক; পণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁর বেশভূষার পারিপাট্য এবং বৈশিষ্ট্য লখ্‌নৌকে মনে করিয়ে দেয়; জানতাম, সৌখিন দিল্লীওয়ালারাও সখের ব্যাপারে লখ্‌নৌয়ের অনুসরণ করেন।

যাই হোক, গাড়ি ছাড়বার সময়ে ভীড় এমনই জমে উঠল, যাকে বলে প্যাকড্, ঠিক তাই। বসেছে যতগুলি, দাঁড়িয়েছে তার অর্ধেকেরও বেশী। কিন্তু তার মধ্যে এই দিল্লীওয়ালা দু'জন বেশ নিশ্চিন্ত মনে নিজ নিজ বিছানায় শুয়ে-বসে আরামে চলেছেন। তাতে কেউ কোন অপত্তিও করছে না। কি জানি কেন, আমার

প্রতি একটু অনুগ্রহ দেখিয়েছিলেন মিয়াঁ সাহেবেরা, যার ফলে একত্রে বসে কথা কইতে কইতে যাওয়া যাচ্ছিল।

কথা হচ্ছিল,—দিল্লী সরকারের আমলদারীতে কোন্ দিকে তরক্কি হচ্ছে, সরকারী সব কিছুই তাজ্জব ব্যবস্থা, ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক

দিল্লীওয়ালা সৌখিন ব্যক্তি বসে আছেন

কথাই। এমনি নানা কথার পর—দিল্লী শহরের সুখ-সুবিধার কথার শেষে, হামামে স্নানের কথায় এসে পড়া গেল। হামাম অর্থ স্নানাগার। এ সম্বন্ধে মিয়াঁ সাহেব বললেন,—দিল্লীতে বড়-দরগার কাছেই ওখানকার বড়-হামাম। শেষে আমায় বন্ধুভাবেই

প্রতিশ্রুতি দিলেন, যদি আমি স্নান করতে চাই, তা'হলে তিনি ঐ বড়-হামামে তার ব্যবস্থা করে দেবেন। সেখানে স্নান করলে আমার শরীর নীরোগ হয়ে যাবে এবং একমাস আর স্নান করবার দরকার মনে হবে না।

লোকটি মেহেরবান্ অর্থাৎ দয়ালু তো বটেই,—পরন্তু গঃরগান্ এবং কদরদান্ও বটে। তারও পরিচয় পেলাম যখন আমার পরিচয়ে চিত্রকর জানতে পেরে বললেন, দিল্লীতে অনেক বড় বড় আমীরের দরবারে তাঁর যাতায়াত আছে, সেখানে তিনি আমায় তাদের সঙ্গে দেখাশুনা করিয়ে দেবেন এবং কিছু কাজকর্মও যোগাড় করে দিতে পারবেন। মিয়াঁর মুরুব্বিয়ানার ভাবটি চমৎকার, সর্বক্ষেত্রে বিস্তৃত। তার মধ্যে সৌজন্যের আভাস, অহম্ কর্তার ভাব আর দম্ভ, এই তিনটি মিশিয়ে আছে। চমৎকার প্যাটার্ন।

এই ভাবে দিনটা কাটল। ক্রমে বৈকাল থেকে হাজারিবাগ রোড ছাড়াবার পর পাহাড়ের রাজ্যে পড়া গেল। পরেশনাথের দৃশ্য যে কি সুন্দর তা সবাই জানে; এই লাইনে যেমন, কর্ড লাইনেও তেমনি মধুপুর, জেসিডি, শিমূলতলা হয়ে ঝাঁঝা পর্যন্ত ঐ দৃশ্য; আবার লুপ্ লাইনেও জামালপুর পর্যন্ত দৃশ্যের তুলনা নেই। যাই হোক, এখন এই লাইনে কোডারমা ও গজহাণ্ডি, তার মধ্যের সুড়ঙ্গ-গুলি পেরিয়ে রাত্রি সাড়ে আটটা নাগাদ গাড়ীখানা গয়া স্টেশনে এসে দাঁড়াল।

এখানে ইঞ্জিন বদল হয়, কাজেই অনেকক্ষণ, বোধ হয় পঁচিশ মিনিট কিম্বা আধ ঘণ্টা থামবার কথা। দেখলাম, আমাদের কামরায় দরজার কাছে যারা আছে তারা কাকেও উঠতে দেবে না বলে বেশ জোর করে দরজা ভাল রকম চেপে রইল। ভিতরে যারা বসেছিল

তারা একটু হাত-পা ছড়াবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করছিল, কিন্তু জায়গা ছাড়বার দিকে কারো কোনরূপ ইচ্ছা দেখা গেল না। যারা আগে থেকে জায়গা পেয়েছিল, তারা সবাই একেবারে ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে নিশ্চিত-দখলের বিশ্বাসে নাক-ডাকাবার যোগাড় করলে। আমার পাশে ও সামনে দুই দিল্লীওয়ালাই সবার ওপর আরাম ভোগ করছিলেন, কারণ গয়া স্টেশনে গাড়ীটা দাঁড়াবার আগেই তাঁরা শুয়ে পড়লেন,—আর তখন আমার দিকে একবার চেয়েও দেখলেন না। আমি বসে বসে ভাবছি—সারা রাত এই ভাবে যেতে হবে নাকি ?—দুই বেঞ্চের মাঝে একটু বিছানাটা বিছিয়ে নিলে কি রকম হয় ? কিন্তু ঐ ভাবনা পর্যন্তই,—সাহস হোলো না বিছানাটা বিছুবার,—কেননা আমাদের এ গাড়ীতে আর একজনও বাঙ্গালী নেই—কাকেও দেখিনি, কাজেই আমি যেন একলাই, আর তাই কতকটা যেন অসহায়ও বটে।

কাকেও উঠতে নামতে দেখলাম না প্রথম দিকে, হাত বাড়িয়ে জানালা দিয়েই কেনাবেচার কাজ চলছিল,—তারপর সময়ও কেটে গেল অনেকটা, ইঞ্জিন বদলেরও কাজটা হয়ে গেল, হাল্‌কা একটু ধাক্কা দিয়েই যেই একটু পিছিয়ে এসে স্থির হয়েছে গাড়ীখানা,—ভাবছি এইবার ছাড়বে, আর দেরী নেই,--এমন সময় একটা দম্‌কা ঝড়ের মত একদল যাত্রী গাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়ল। যারা দরজার কাছে চেপে বসেছিল, তারা কিছুতেই ঠেকাতে পারলে না। আমার বুকের ভিতর গুরগুর করে উঠল সেই দল দেখে। সবার আগে হোঁৎকা হোঁৎকা জন তিনেক মর্দ্দ-- পিছনে কুলীর মাথায় মালপত্র ; তারপরেই মেয়েছেলের দল পিল পিল করে ঢুকল।

বেশভূষায় কিছু বুঝা গেল না, কারণ মেয়েদের মধ্যে বৃদ্ধা আর

প্রৌঢ়াদের ছাড়া সবারই গায়ে ওভারকোট। বৃদ্ধাদের সর্বশরীর গরম কাপড়ে ঢাকা। প্রথমে বুঝতেই পারলাম না তাঁরা কোন্ দেশের মানুষ। সেটা অবশ্য বুঝা গেল তখনই, যখন কুলীর ভাড়া মিটাতে তাঁদের ভাষা বেরুল। এরা পশ্চিমের হিন্দুস্থানী নয়, মুসলমান নয়, বোম্বাইওয়ালা নয়—সত্যই আশ্চর্য হয়ে, বিস্ফারিত নয়নে দেখলাম এবং বুঝলাম এঁরা খাঁটি বাঙ্গালী। তারপর যখন শুনলাম 'অ ইন্দু তোর হাতে লেগেছে নাকি,—তোরঙ্গটা কোথায় নামালি, হাঁরে অ কুলী' ইত্যাদি, তখন আর সন্দেহমাত্র রইল না। এ দলে ষাট বছরের বুড়ী থেকে প্রৌঢ়া, কিশোরী, বালিকা, শিশু সকল রকমই আছে। আরও দেখলাম শেষে, দলটি মেয়েদেরই,—একটি মাত্র ছোক্‌রা এদের অভিভাবক,—তার নাম নীহার কিম্বা সৌরীন, ঠিক মনে নেই। এখন সকলকার ওঠা হয়েছে এবং এবার গাড়ী ছাড়বে দেখে সেই প্রথমে যে তিনজন জোয়ান মরদ উঠে এদের পথ করে ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁরা নেমে প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে দরজাটি বেশ করে বন্ধ করে দিলেন, তারপর মহা-উৎসাহে, প্রবীণাদের একজনকে ডেকে বললেন,—কেমন জ্যেঠাইমা! দেখুন,—বলেছিলুম, যতই ভীড় থাক তুলে দেবোই,—এখন হয়েছে তো? এখন নীহারই আপনাদের কাশীতে পৌঁছে দেবে সঙ্গে করে। আমরা দায়ে খালাস।

বলা বাহুল্য, জ্যেঠাইমা অনেক মিষ্টি কথা, অনেক আশীর্বাদ করে দেওরপোদের বিদায় দিয়ে নিজেদের ব্যবস্থায় মন দিলেন। এদিকে নীহার বা সৌরীনের হল বিপদ। ছেলেমানুষ সে ততটা নয়, যতটা অপ্রস্তুত এই সব বিষয়ে। সে যে রোগা বা দুর্বল তাও নয়, সাধারণ স্বাস্থ্যবান যেমন হয় সেই রকম। বয়স প্রায় কুড়ি

হবে, দেখতে সুশ্রীও বটে, কিন্তু আরামপ্রিয় প্রকৃতি তার মুখে যেন মাখানো। সে দাঁড়িয়ে যেন অবাক হয়ে চারিদিক দেখলে, তারপর অনুযোগের সুরে মেয়েদের দিকে লক্ষ্য করে বললে,—দেখেছিস ইন্দু! এদের আক্কেলটা,—জায়গা জুড়ে গড়া গড়া শুয়ে আছে, যেন আর কারো বসবার অধিকার নেই। তারপর আপাদমস্তক মুড়ি-দেওয়া একজনের কাছে গিয়ে মিনতির সুরে বললে—এই, উঠ তো ভাই থোড়া, জানানা লোককো বৈঠ্‌নেকো জায়গা দেও—দেখতা নেই, সবাই খাড়া হ্যায়। এই যুক্তিযুক্ত অনুযোগ যে অবস্থায় ফলপ্রসূ হত এটা যে সে অবস্থা নয়, এ-কথাটা বুঝতে নীহারবাবুর কিছুক্ষণ গেল। তা সত্ত্বেও সে,—উঠো ভাই, উঠো না—ইত্যাদি বলে অসহায় দৃষ্টিতে মেয়েদের দিকে চেয়ে তাদের এই কথাই বুঝাতে চাইলে যে, এরা উঠছে না, এখন আমি কি করব?

কে বা কার কথা শোনে, ভাই বললেই এখানে কেউ ভাই হয়ে ওঠে না। এ কথাটা এক্ষেত্রে সবাই জানে। কেউ উঠল না দেখে আমাদের নীহারবাবু একেবারে হতাশ হয়ে হয়তো মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়তেন, কিন্তু কোথায় বসবেন সে জায়গাই বা কোথা'? ওধারে সাত-আটটি জানানা লোক চারিদিকে চেয়ে দেখছেন, কোথাও কোনও ফাঁক আছে কিনা।

আমাদের দেশের মেয়েদেরই যথার্থ অভিজ্ঞতা আছে। বর্তমান দেশ, কাল ও পাত্র সম্বন্ধে তারাই যথার্থ ওয়াকিবহাল যাকে বলে ঠিক তাই। আমাদের এই গাড়ীর মেয়েদের মধ্যে যিনি জ্যেঠাইমা, তিনি নীহারের দিকে চেয়ে বললেন,—হাঁরে নীহার, ও রকম করে বললে কি ওরা উঠবে, একটু জোর করে ওদের তুলতে হবে যে,—না ওঠালে চলবে কেন?

কয়েকটি ছোট মেয়েছেলেকে তোরঙ্গ-বাক্স যে কয়েকটা ছিল তার উপর বসিয়ে, এবার একটু একটিভ্ হয়ে নিজেদের জন্য স্থান-সংগ্রহের কাজে লাগল নীহার। তাদের মধ্যে একটি মেয়ে, এই দলের মধ্যে মাথায় বোধ হয় পাঁচ ফুট, সুন্দর ফুটফুটে, কোন স্কুলের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রীই বা হবে, তার কপালে একটি বেশ বড়ো কালো টিপ্ জ্বলজ্বল করছে, ওভারকোট পরা,—চৌদ্দ পনেরো বছরের সেই মেয়েটি নীহারের দিকে সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিপাত করছিল, অথচ তার হাত দুটি কাজেই ছিল, গোছগাছের মধ্যে। দেখলাম, নীহারের সঙ্গে তার মুখের একটা সৌসাদৃশ্য রয়েছে। হঠাৎ সে একবার নীহারের দিকে চেয়ে দাদা বলে ডাকলে, তারপর সেই আগাগোড়া মুড়ি-দেওয়া লোকটার দিকে যেন কি দেখিয়ে দিলে।

নীহারের পৌরুষ এবার যেন বেশ খানিকটা জেগে উঠল। সে এবার জোর করেই 'উঠো' 'উঠো' বলে লোকটিকে তুলে দিলে, আর যেই সে উঠল, অমনি নীহার দাঁড়িয়ে গেল সেই বেঞ্চের উপর। ঠিক তার ও-পিঠে আমাদের দিল্লী-সহযাত্রীর একজন, সেই প্রৌঢ় মিয়াঁ আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে আছেন। কিন্তু তিনি জেগেই আছেন।

নীহার এখন সাহস পেয়ে তাঁর গায়ে হাত দিয়ে একটু ঠেলে, 'উঠো জি, উঠো' বলে ওঠাবার চেষ্টা করতেই, সেই মিয়াঁ ধড়মড়িয়ে উঠে বসেই অল্পক্ষণেই চারিদিক একবার দেখে কিংকর্তব্য স্থির করে নিলেন। তারপর সতেজে বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে উঠে, ডান হাতে ঘুঁষি পাকিয়ে, বক্তৃতার ঢংয়ে য[illegible] উচ্চঃস্বরে চীৎকার আরম্ভ করলেন, তখন দেখা গেল তাঁর সামনের একটা দাঁত নেই।

এই, কৌন্ বেওকুফ্, বেতমিজ্, হামকো উঠো, উঠো করতা হৈ।

ম্যয় কলকত্তাসে পুরা মাস্‌ল দেকর আপনা জগহ্ মেঁ বৈঠ্‌তে শোতে আতা হুঁ, আপনা জগহ্ মেঁ শোতে শোতে দিল্লী তক্ জায়গা, কোইকো উঠানে কো একতিয়ার নহীঁ···ইত্যাদি।

সেই দাড়িওয়ালা খাস মূর্তি দেখেই নীহার গেল দমে; মুড়ি দেওয়া ছিল বোলে অনুমান করতে পারেনি যে, ভিতরে কি পদার্থ আছে। এখন গলার স্বরটি যথাসম্ভব নরম করে আর যথার্থ মিনতির সঙ্গেই বললে, এত্‌না গোস্‌সা করতা কাহে ভাই, বিচার করকে দেখোতো এত্‌না আদমী খাড়া হ্যায়,—একটু জায়গা যদি না ছোড়েগা তো বৈঠেগা কাঁহা, যায়েগা কাঁহা, আপ্‌হি বাৎলাও?

মিনতির স্বরে নরম হওয়াটা মিয়াঁর ধাতে ছিল না। মিনতি কাপুরুষদের অস্ত্র; সুতরাং আরও উত্তেজিতভাবে নীহারের মুখের কাছে হাত নেড়ে তিনি বললেন, কাঁহা জাওগে হমারা ক্যা মালুম, জাঁহা খুশি যাও, চুল্‌হেমেঁ যাও, জাহান্নম্‌মেঁ জাও।···

কপাল থেকে বিন্দু বিন্দু ঘাম গড়িয়ে এসে নীহারের মুখে পড়ছিল, বেচারা হাত দিয়ে মুছে নিয়ে বেঞ্চি থেকে নেমে এলো আস্তে আস্তে।

এই ভাবে যখন বেশ একটা শোরগোল পাকিয়ে উঠেছে, ট্রেনটাও স্টার্ট দিয়েছে,—তখন ইন্দু, নীহারের সেই বোনটি, করলে কি, তীব্রদৃষ্টিতে মিয়াঁর দিকে একবার দেখে, হাতের কাজটাকে ফেলে দিয়ে গট্ গট্ করে এসে তার সামনাসামনি বেঞ্চের উপরে উঠে দাঁড়াল, তারপর—এই তোম্ গালি দিয়া কাহে—হামলোক কাঁহা যায়গা?-ম কেয়া বোলা—ফির ঔর একবার বোলো তো?···

তেজীয়ান সেই দিল্লীওয়ালা বীর, বালিকার এ চ্যালেঞ্জ গ্রাহ্য

করবে কেন,—এখনও সেই রকমই বরং আরও জোর গলায়—হাঁ, হাঁ, কেঁও নহি বোলেগা, শও দফে বোলেগা, হাজারো দফে বোলেগা,—চুল্‌হেমেঁ জাও। তুম্‌লোগ্, জাহান্নমমেঁ জাও, জাঁহা খুশী জাও, হমারা ক্যা?—কথাগুলি বোলেই যেন হাঁফ ছাড়লে লোকটা।
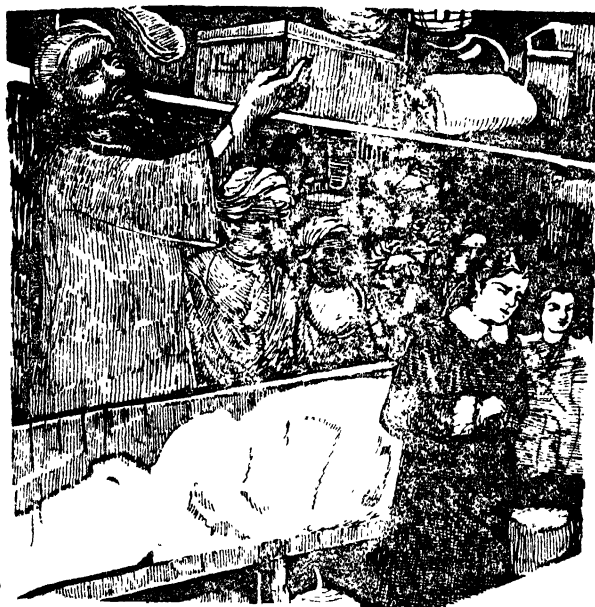
'তুম্‌লোগ্ জাহান্নমমেঁ জাও, জাঁহা খুশী জাও, হমারা ক্যা?'

ইন্দু সঙ্গে সঙ্গেই,—এয়সা বাত্ ঔর মুসে মৎ নিকালো,—বলে বাঁ হাতে তার দাড়িটা মুঠোতে ধরে সজোরে ডান হাতে এক চড় কষিয়ে দিলে তার গালে। অভাবনীয় দ্রুতগতিতে কাজটা হয়ে গেল—শব্দটাও আমরা সবাই শুনলাম। তারপর,—ফির, মুখ সামালকে বাৎ করো,—বলতে বলতে ইন্দু নেমে গট্ গট্ করে নিজেদের দলের মধ্যে

এসে দাঁড়ালো। ঠিক ঐ সময়েই গাড়ীটা প্ল্যাটফর্ম্ ছাড়িয়ে গিয়ে মোশান্ দিয়েছে।

আমরা গাড়ীসুদ্ধ সবাই স্তম্ভিত। মিয়াঁও প্রথমটা অবাক, তারপর সেই রকমই চীৎকারে যেন গলা ফাটিয়ে ফেললে; পায়ে টিপ দিয়ে উঁচু হয়ে, তওবা তওবা, ই ক্যায়সী লড়কী—হমারা হুঁয়া হোতে তো ফওরন্ কত্ল্ কর্ দেতে— ইত্যাদি বোলে চীৎকার করতে লাগল। হৈহৈ কাণ্ড, যারা শুয়েছিল সবাই উঠে বসেছে তখন।

এতক্ষণ আমার দিল্লীর খানদানী মুরুব্বি আপাদমস্তক সর্বাঙ্গ ঢেকে পড়েছিলেন, এইবার তিনিও উঠলেন। প্রথমেই তাঁর সঙ্গীর হাত ধোরে,—বৈঠ্ জাইয়ে, বৈঠ্ জাইয়ে—বোলে তাকে বসিয়ে দিলেন, তারপর নীহারের দিকে চেয়ে,—আপ্লোগ্ সব্ বৈঠ্ জাইয়ে,—বোলে তাঁদের দু'খানা বেঞ্চের বাকী সব জায়গা থেকে গুটিয়ে নিলেন—তখন সবাই এসে বসলো। ব্যাস, অল্পক্ষণেই সব বিছানা চুপচাপ, মিয়াঁও গতিক বুঝে স্থির হয়ে গেলেন।

জ্যেঠাইমা তখন আস্তে আস্তে বলছেন,—আজ কি কাণ্ডটা করলি বল্ তো ইন্দু—ঘরেও যেমন বাইরেও তেমনি! ধন্যি মেয়ে বাবা! এই নাকে কানে খত, যদি তোকে সঙ্গে নিয়ে আর কোথাও যাই!

ইন্দু চুপ করে শুনলে কথাগুলি, তারপর ফিক্ করে একটু হেসে,—তেমনি আস্তে আস্তেই বললে,—তা বোলে গালাগাল সহ্য করতে হবে?

অরোরা বোরিয়্যালিস্

বা

মেরু জ্যোতির্মণ্ডল

এমন উজ্জ্বল জ্যোতি ক্বচিৎ দেখা যায় এখন যা দেখা গেল। মাঝ আকাশেতে, উত্তর থেকে সোজা দক্ষিণে, বিচিত্র ঐ উজ্জ্বল আলোক বিরাট একটা ডিমের আকারে বিস্তৃত, যেন উজ্জ্বল আলোকময় একটা ইলিপ্‌স্।

দেখতে দেখতে মধ্য আকাশের ঐ জ্যোতির আকার বদল হতে আরম্ভ হয়ে গেল, বোধ হল যেন বিরাট একটা জ্যোতির্ময় সরীসৃপ উপর দিকে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রসারিত করতে করতে চলেচে কুমেরুর দিকে। আর ঠিক ঐ সময়ে গাঢ় নীলাকাশের তারাগুলি একের পর একটি করে অদৃশ্য হয়ে গেল, ঐ জ্যোতির্ময় সরীসৃপের কুণ্ডলীকৃত অঙ্গ যেন তাদের ঢেকে দিলে। দেখলাম বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে এখানে এক বিয়োগান্ত নাটকের খেলা ;—ঐ সরীসৃপটা যেন দৈত্যের মত এসে স্বর্গের সৌন্দর্যকে গ্রাস করে ফেললে। হঠাৎ ঐ সরীসৃপ-দৈত্যের অন্তর্ধান, সঙ্গে সঙ্গে তারাগুলির পুনঃপ্রকাশ, সঙ্গে সঙ্গে আবার বিচিত্র বর্ণোদ্ভাসিত স্বর্গের যবনিকাটা অদৃশ্য হয়ে গেল,—আর পরক্ষণেই প্রবল বাতাসে বিশাল মেরুক্ষেত্র আলোড়িত হতে লাগল। এ বাতাস আমাদের পক্ষে অসহ্য।

বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে এই কথা ভাবতে ভাবতে আমার আশ্রয়-গহ্বরে ঢুকলাম। আজ যে বস্তু আমি প্রত্যক্ষ করলাম তা থেকে কোলাহলপূর্ণ মরজগৎবাসী বঞ্চিত।

(এডমিরাল বাইয়ার্ডের বিবৃতির বাঙ্গলা অনুবাদ)